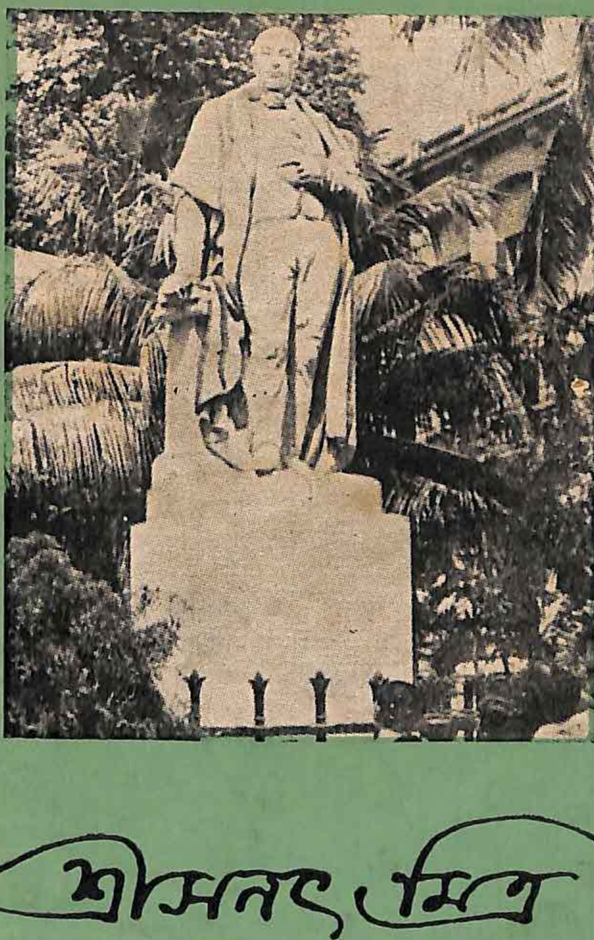
'প্রভাতী তারা'

ডেভিড হেয়ার



শ্রীসনৎ মিত্র

"প্রভাতী তারা"

ডেভিড হেয়ার

[১৭৭৫—১৮৪২]

শ্রীসনৎ মিত্র

বিশ্বাস পাবলিশিং হাউস
৫/১ এ, কলেজ রো, কলিকাতা-৯

প্রকাশক :
শ্রীবীরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস
৫/১এ, কলেজ রো
কলিকাতা ৯

মূল্য : বারো টাকা মাত্র

প্রচ্ছদ : শ্রীমুরারি গুহ

মুদ্রাকর :
শ্রীহরিনারায়ণ দে
শ্রীগোপাল প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
২৫।১এ, কালিদাস সিংহ লেন,
কলিকাতা ৯

আমার পূজনীয় মাষ্টার-মশাই

ড. শ্রীহরপ্রসাদ মিত্র

শ্রীচরণকমলেষু

ছু-টি কথা

রবীন্দ্রনাথ মারমুখী এবং পালকরূপী ছু-ধরণের ইংরেজদের দেখে তাদের ছোট ইংরেজ আর বড় ইংরেজ এই ছু-ভাগে ভাগ করেছিলেন। ছু-শ বছরের বেশী সময় ধরে ইংরেজদের সঙ্গে ঘর করে এই কথার সত্যতা আমরা বুঝেছি। আমরা ক্লাইভ, কার্জন, এণ্ডারসন, ও-ডায়ারকে যেমন দেখেছি, তেমনি উইলিয়ম কেরী, ডেভিড হেয়ার, ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুন প্রমুখকেও পেয়েছি। কেউ আঘাত করে আমাদের দৃঢ় করেছে, আবার কেউ বা অদ্ভুত বৈপরীত্যের সঙ্গে আদর-ভালবাসা দেখিয়ে আমাদের হৃদয়ে জায়গা করে নিয়েছেন। এক ভাগ বিদ্বেষ ও ক্রোধ দ্বারা কালা-আদমির দেশের ঘৃণ্যগুলির ওপর ভৃত্যের শাসন চালিয়েছে; আবার কেউ বা সাতসমুদ্র-তের-নদীর পারের এই শ্যামল মাটির অভাগা মানুষগুলিকে স্নেহ-প্রীতি-সেবা দিয়ে কোলে তুলে নিয়েছেন। আমাদের আলোচ্য ব্যক্তি মহাত্মা ডেভিড হেয়ার দ্বিতীয় দলভুক্ত। অদ্বিতীয় এক করুণাঘন-হৃদয় নিয়ে তিনি এদেশের মাটিতে পা দিয়ে সেই যে এখানকার আকাশ-জল-মানুষ-মাটিকে ভালবেসে ফেললেন তাতে তাঁর অর্জিত বিপুল সম্পদ, বহু দূরে রেখে আসা পিতৃভূমি আর পঞ্চভূতে গড়া দেহটিকে এখানকার মাটি-মাকে উপহার দিতে হলো। এ এক অশ্রুতপূর্ব প্রেম-তন্ময় মহৎ-পূজা। এবং এই তন্নিষ্ঠ পূজা না থাকলে আমাদের আজকের ইতিহাসের চেহারা কেমন হোত তা বলা কঠিন। তাই বর্তমান বাংলা তথা ভারতের সভ্য ও জ্ঞানের রম্য সৌধের উপর দাঁড়িয়ে আমি তার ভিত্তি নির্মাতাদের প্রধানতমকে স্মরণ করে জাতীয় ঋণ কিঞ্চিৎ লাঘব করার চেষ্টা করলাম। এ কাজ না করলে আমাদেরকে অকৃতজ্ঞতার দায়ে পড়তে হতো।

আমার এ গ্রন্থে কোনো গবেষণা নেই। বহুদূর থেকে আসা একটি মহৎ-হৃদয় সম্পর্কে সব বয়সের বাঙালীরা যাতে কিছুটা প্রাথমিক খবর সংগ্রহ করতে পারে সেই উদ্দেশ্যে এটি রচিত। তবে এতে তথ্যের কোন অপহ্নব ঘটানো হয় নি—সবই যুক্তি ও প্রমাণ দ্বারা পূর্বাহ্ণেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে এ কথাও সবিনয়ে বলা প্রয়োজন যে উক্ত মহাত্মার দ্বিশত জন্মবর্ষের সূচনায় আমিই প্রথম বাঙ্গালী যে একটি দৈনিক সংবাদ পত্রে ['সত্যযুগ' ৯. ২. ৭৬] একটি পূর্ণাঙ্গ প্রবন্ধ রচনা করেছি। সেটি উপসংহারে মুদ্রিত হলো। তার সঙ্গে রইলো হেয়ারের মৃত্যুর পর শবযাত্রার একটি বিবরণ, ১৮৩১ সনে প্রদত্ত সম্বর্ধনা এবং তার উত্তরে হেয়ারের বক্তব্যের বঙ্গানুবাদ।

এই গ্রন্থ রচনার ব্যাপারে বন্ধুবর ড. শ্রীপ্রভাতকুমার গোস্বামী, ড. শ্রীপল্লব সেনগুপ্ত ও শ্রীঅসিত ব্রহ্ম, অনুজপ্রতিম শ্রীপরিতোষ পাল, শ্রীজয়দেব কর্মকার ও শ্রীহারাধন ভট্টাচার্যের কাছে কৃতজ্ঞ। সুকবি ও সমালোচক ড. শ্রীসুশীল গুপ্ত আমাকে কিছু তথ্য সংগ্রহ করে দিয়ে ঋণী করেছেন। অগ্রজতুল্য শ্রীবীরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস ব্যতীত এই বই প্রকাশিতই হতো না। তাঁর কাছে কৃতজ্ঞতা স্বীকার বাহুল্য মাত্র।

১৭. ২. ৭৬

ইতি—

গ্রন্থকার

"কৃপানিধি ডেবিড হ্যারকে কল্লে হরণ।
মরণের, বুঝি নাই কো মরণ ॥
সদা, হাহা হাহারবে, কাঁদে শিশু যবে,
ত্রিভুবনে হবে, আর কি তেমন।
হায়, কে করিয়া প্রীতি, বালকের প্রতি,
পিতৃভাবে করে, স্নেহ বিতরণ ॥

হোয়ে শশি সুধাহত, চকোরের মত,
ছাত্রগণ যত, করছে রোদন। ১ ॥
খেদে, ভনে রসময়, এই অসময়, কোথা
দয়াময় রইলে এখন।
প্রভু একা আমায় ফেলে,
কোথা তুমি গেলে,
কোথা গেলে পাব তোমার চরণ। ২ ॥"

[ডেভিড হেয়ারের মৃত্যু হলে কাতরচিত্তে কোনো এক কোলকাতাবাসী এই গানটি রচনা করেন। এবং সেকালে কোলকাতার পথে পথে ভিখারিরা এই গানটি গেয়ে ভিক্ষা করতো]

১.

কোলকাতার দক্ষিণ-পশ্চিম দিকের গঙ্গার ধারের একটা বাড়ী থেকে হু-হুম-না শব্দ তুলে একটা পাল্‌কি ছুটে চলেছে লালদীঘির ধার দিয়ে, ডোমতলাকে পাশ কাটিয়ে, কলুটোলার পথ ধরে পটল-ডাঙ্গা, আরপুলি, বেনেটোলার দিকে।...হু-হুম-না, হু-হুম-না।

পাল্‌কিটা বেশ জোর কদমেই চলেছে। ভেতরে এক গোরা সাহেব দশাসই চেহারা নিয়ে বসে আছেন। কোলের কাছে রয়েছে নানান মাপের কি সব শিশি-পত্তর। একদিকে কতকগুলি বই-কাগজ। পাল্‌কি চলেছে, আর সেই সাহেব ভুল্‌কি চালে একটু হেলান দিয়ে মাথাটা একটু নিচু করে বাইরের দিকে দেখছেন—আর মাঝে মাঝে বিড় বিড় করে কি যেন বলছেন !

আর সব চেয়ে আশ্চর্য, সাহেবের ঐ পাল্‌কির সঙ্গে সঙ্গে নানা বয়েসের কিছু ছেলে ছুটছে,—ছুটছে। তারা কেবল ছুটছেই না সুর করে কিছু যেন বলছেও, পাল্‌কির মধ্যে সাহেবকে উদ্দেশ্য করে।

একটু কান পেতে শুনতেই বোঝা গেল যে ঐ ছেলেরা যা বলছে তা হচ্ছে ইংরেজী ভাষা। আর সে ইংরেজী বড় অদ্ভুত ধরণের।

আর একটু সজাগ হতেই শোনা গেল ঃ

'me poor boy' [আমি গরীবের ছেলে] ...'have pity on me' [আমার ওপর দয়া করুন] ... 'me take in your school' [আমাকে আপনার স্কুলে নিন] ... ... 'me poor boy'...'me... এক সঙ্গে টেনে টেনে বলছে বলে দূর থেকে শুনে মনে হচ্ছে যে ওরা বুঝি গানের সুর ধরেছে।

সকালে সাহেবের বাড়ী থেকে পাল্‌কি বেরুনোর পর, সারাদিন যেখানে যেখানে সাহেবের পাল্‌কি যায় সেখানেই এই দৃশ্য। দেড়শ' বছর আগের কোলকাতার এক নিত্যদিনের ছবি।

নতুন কেউ কোলকাতায় এসে পড়লে এই দৃশ্য দেখে অবাক হয়। থম্‌কে দাঁড়ায়। সাহেবের পাল্‌কির সঙ্গে ছোটা এই অভিনব বালক-ভিক্ষুকদের দেখে জানতে চায় কেন ওরা অমন করে ছোটে, শুনতে চায় কি ওরা বলে।

'ওমা, তাও জানেন না। আপনি বোধ হয় কোলকাতায় নতুন। ওটা হচ্ছে হেয়ার সাহেবের পাল্‌কি। আর ঐ ছেলেরা সাহেবের পটলডাঙ্গা বা আরপুলির স্কুলে পড়তে চায়। তাই অমন করে ছুটছে।

'তা, পড়তে চায় তো গিয়ে পড়লেই পারে। অমন করে ছুটছে কেন?'

'ছুটবে না? হেয়ারের স্কুলে ভর্তি হওয়া কি সোজা ব্যাপার। তাছাড়া ফ্রি ভর্তি হতে পারা যে ভীষণ কঠিন।'

হ্যাঁ ঐ ভাবেই পাল্‌কির সঙ্গে ছুটে ছুটে-ই সেকালের কত ভালো ভালো ছেলে তখনকার কোলকাতায় দু-চারটে যে ইংরেজী শেখার স্কুল হয়েছে, সেইখানে ভর্তি হতে চেয়েছে। নতুন কালের লেখাপড়া শেখায় নিজেদের একাগ্রতা প্রমাণ করে তবে হেয়ার সাহেবের সহানুভূতি আদায় করেছে।

ইংরেজ দেশে রাজা হয়ে বসেছে। ব্যবসা-বাণিজ্য, শাসন-শোষণ সব কিছুতেই ইংরেজ আর ইংরেজীর জয়-জয়কার। ইংরেজী শেখ, ইংরেজের সঙ্গে মেশো তবে তোমার ভাগ্য ফিরে যাবে, রুজি-রোজগারের কোনো অভাব হবে না। এমন দিনে হেয়ার সাহেব কোলকাতায় ইংরেজী স্কুল, নতুন পদ্ধতির বিদ্যালয় খোলবার স্বপ্ন দেখতে লাগলেন। এতে যে কেবল ইংরেজীরই সুবিধে হবে তাই নয়, এদেশের দরিদ্র, কুসংস্কারাচ্ছন্ন মানুষগুলোও পাশ্চাত্য জগতে জ্বলে ওঠা নতুন আলোর সন্ধান পেয়ে নিজেদের ভবিষ্যৎকে আরও সুন্দর করে গড়ে তুলতে পারবে। এই সব চিন্তায় তিনি অস্থির হয়ে

পড়তেন, তাঁর রাতে ঘুম আসতো না। পথে চলতে চলতে রাস্তার দু-ধারের মানুষগুলিকে দেখে ভাবতেন যে এত বড় জাতি আজ কোথায় এসে দাঁড়িয়েছে। এমন সোনার দেশের আজ এ কি হাল হয়েছে। এর থেকে কি এদের মুক্তি নেই! কিসে এর থেকে নিস্তার পাওয়া যাবে!

এই সব চিন্তা করতে করতে অসীম মমতায় হেয়ারের চোখ দুটো ছল ছল করে আসতো। নীল চোখের পাতা ভারী হয়ে উঠতো—সমুদ্রের বুকের উপর বর্ষার কালো মেঘ নামার মতো। তিনি যেখানেই যেতেন দেশীয় বড়লোক বা পণ্ডিত লোকদের দেখলেই বলতেন দেশের ছেলেদের লেখা-পড়ার কথা। বোঝাতেন যে শিক্ষাই একমাত্র আলো যার সাহায্যে জমে থাকা দীর্ঘ দিনের অন্ধকার দূর করা যাবে। আর কিছু নয়, বক্তৃতা নয়,—শাস্ত্র পড়ানো নয়, জ্ঞানের দরজার চাবি দেশের লোকের হাতে তুলে দাও, তারা নিজেরাই খুঁজে নেবে কোনটা ভাল, কোনটা মন্দ। মানব-সভ্যতার সবচেয়ে বড় যে সম্পদ—বিদ্যা, আধুনিক শিক্ষা এদেশের আগামী নাগরিকদের মধ্যে যতটা পারো বিলোবার ব্যবস্থা করো।

সকলেই তাঁর কথা বোঝেন, মনেও ধরে তাঁর কথাগুলো। কিন্তু কি ভাবে যে কি করা যায় তা বুঝে উঠতে পারে না:

'হেয়ার তুমিই ভাবো না কি করা যায়?'

'আমি! আরে আমি যে সামান্য এক ……'

২.

হ্যাঁ! কে এই সামান্য হেয়ার সাহেব। কোথা থেকেই বা এলেন তিনি? সাহেব হয়ে তাঁর-ই বা কেন এত মাথা ব্যথা—এদেশের ছেলেদের লেখাপড়ার জন্যে।

সত্যিই, এ এক অবাক কাণ্ড! ইংরেজ—যারা এই দেশের মানুষগুলোকে ছাগল-ভেড়ার মতো মনে করে; এই দেশকে কপিল গাই-এর মতো ভাবে: শুধু দুয়ে যাও, দুয়ে যাও,—রক্ত নিংড়ে সাদা করে ফেলো: সেই ইংরেজ জাতের লোক হয়ে কি না দেশী মানুষদের জন্যে দয়া দেখায়, তাদের জন্যে কাঁদে, তাদের সেবার জন্যে নিজের সর্বস্ব বিলিয়ে নিঃস্ব হয়ে গিয়েও মন ভরে না।

এ এক অপূর্ব—মহৎ—ঘটনা। অথবা কংসের কারাগারে কংসের হত্যাকারীর জন্ম হওয়ার মতোই,—ইংরেজের রাজত্ব-ধ্বংসের বীজ ইংরেজের হাত দিয়েই পোঁতার ব্যবস্থা।

সব শুনে সবায়ের কৌতূহল ক্রমেই জমে উঠছে! জানতে ইচ্ছে হচ্ছে যে কে এই হেয়ার সাহেব! কি তাঁর পরিচয়?

সত্যি আমরাও যেন তাঁর অপূর্ব জীবন-কথা বর্ণনা না করে আর স্থির হতে পারছি না।

তবে শোনা যাক:

১৭৭৫ খ্রীস্টাব্দের ১৭ই ফেব্রুয়ারী স্কটল্যাণ্ডের এক দরিদ্র গ্রামে হেয়ারের জন্ম হয়। হেয়ারের বাবাও ছিলেন একজন ঘড়ির কারিগর। এর থেকে বলতে পারা যায় যে ঘড়ির কারবার ডেভিড হেয়ারদের বংশগত ব্যবসা।

ডেভিড হেয়ারেরা ছিলেন চার ভাই। সাদা-মাটা সংসার, মা-বাবা চার ভাই। ডেভিডই সবচেয়ে ছোট। বড়দের নাম জোসেফ, আলেকজাণ্ডার এবং জন্। এদের মা-ও ছিলেন ঐ দেশেরই এবার্ডিন গ্রামের এক দরিদ্র পরিবারের কন্যা।

কিন্তু বিত্ত না থাক চিত্তের সম্পদে এই হেয়ার পরিবার বাঙ্গালীর কাছে চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন। আমাদের মনে হয় হেয়ার সাহেবের যে পরোপকার করার ইচ্ছা, মানুষের দুঃখে কেঁদে আকুল হওয়া,—এটা তাঁদের বংশগত স্বভাব। কারণ, আমরা দেখতে পাচ্ছি যে কোলকাতায় যখন হেয়ার সাহেবের বেশ নাম ডাক হয়েছে তখন তাঁর বন্ধু রামমোহন রায় বিলেত গেলে এই হেয়ারদের পরিবার তাঁর প্রতি যে আন্তরিক ও বন্ধুত্বপূর্ণ ব্যবহার করেন তা নানা দিক থেকেই মনে রাখবার মতো। যাক্, সে পরের কথা।

আগেই বলেছি যে হেয়ারদের পরিবারে তেমন স্বচ্ছলতা ছিল না। তা না হলে মাত্র পঁচিশ বছর বয়সে ডেভিড নিজের পিতৃভূমি ছেড়ে সম্পূর্ণ এক নতুন এবং অপরিচিত দেশে ভাগ্যানুসন্ধানে পাড়ি জমাবেন কেন? বিশেষত, তখন বিলেতে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে আতঙ্কের শেষ নেই। বাঘ-সাপ-ম্যালেরিয়া-কলেরা-ডাকিনী-ডাইনীতে ভরা এক ভীষণ দেশ। সেখানে যে যায় সে আর ফেরে না। চোর-চোট্টা ছাড়া কি সাধারণ গেরস্থ মানুষেরা সে দেশে সহজে যায়।

যা থাকে কপালে—হয় মরণ, নয় জীবনে সাফল্য লাভ—এই মনে করে ডেভিড পিতামাতার আশীর্বাদ মাথায় নিয়ে সাত সমুদ্দুর পাড়ি জমালেন। বিদেশ যাত্রার আগে ডেভিড হয়তো ভেবেছিলেন যে ভয়ঙ্কর ভারতবর্ষ থেকে আমি আর ফিরতে পারবো না। তাই আসার আগে পিসির বাড়ী, মামার বাড়ী যেখানে যত আত্মীয়-স্বজন আছেন সকলের সঙ্গে দেখা করে আসেন। ভাবটা,—শেষ দেখা দেখে যাই, জীবনে আর দেখা হবে কি না, কে জানে?

ডেভিডের এই ভাবনার সঙ্গে সঙ্গে অন্তরীক্ষে বিধাতাপুরুষ বোধহয় হেসেছিলেন। 'তোমার যাত্রা শুভ হোক'—বলে আশীর্বাদও করেছিলেন হয়তো।

যাই হোক ১৮০০ খ্রীস্টাব্দের কোন এক সময়ে ডেভিড বোধ হয় কোলকাতার মাটিতে পা দিয়েছিলেন। গঙ্গার বুকের ওপর দিয়ে এই দেশে ঢুকতে ঢুকতে হয়তো পঁচিশ বছর বয়সের টগবগে মেজাজের যুবক ডেভিড দু-চোখ মেলে দেখছিলেন বিচিত্র উজ্জ্বল সবুজ দুই-তীরের সৌন্দর্যকে। কত আলোর ঝলমলানি এর আকাশে, কত প্রাণের আঘ্রাণ এর মাটিতে, কত উদারতার স্পর্শ এর বাতাসে। কোথায় সেই রুক্ষ পাথুরে ঠাণ্ডার দেশ স্কটল্যাণ্ড, আর কোথায় এই সুফলা-শস্য-শ্যামলা আলোয় ভরা বাংলাদেশ। সত্যি কি সুন্দর এই দেশ! প্রথম দর্শনেই ভালো লেগে গেল ডেভিডের। চার-চোখের স্থায়ী মিলন হলো। ডেভিড বঙ্গদেশকেই নিজের দেশ হিসেবে গ্রহণ করতে বোধ হয় সেই প্রথম দিনেই তৈরী হয়ে গেলেন।

যত দিন গেছে এই অনুরাগ ক্রমে দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর হয়েছে।

ডেভিড ইংল্যাণ্ড থেকে তাঁদের বংশের ঘড়ির ব্যবসার শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা নিয়ে কোলকাতায় এসেছিলেন। এসে দেখলেন যে এই ব্যবসায়ের এদেশে বেশ সুযোগ আছে। লোকে এই নতুন ব্যবহার্য বস্তুটির ওপর বেশ আকর্ষণ অনুভব করছে। কোলকাতায় হঠাৎ বড়লোকদের নানা সাইজের, নানা ধরণের, হরেক ডিজাইনের ঘড়ি কেনার একটা শখ জেগেছে। আর বাজারে তেমন প্রতিযোগীও নেই। ফলে অল্প দিনেই তাঁর ব্যবসা বেশ জমে গেল। একে নতুন ঘড়ি তৈরী করতে, বিকল ঘড়ি সারাতে ডেভিডের জুড়ি যেমন ছিলেন না, তেমনি তাঁর মিষ্টি ব্যবহার, অমায়িক স্বভাব খরিদ্দারদের খুব সহজেই আকৃষ্ট করতো। তাঁর সঙ্গে একবার যে মিশতো সে তাঁকে স্থায়ী বন্ধু হিসেবে গ্রহণ না করে পারতো না। কাজের গুণে, স্বভাবের

মাধুর্যে কিছু দিনের মধ্যেই কোলকাতার ছোট বড় মহলে একজন ভদ্রলোক, সজ্জন হিসেবে ডেভিডের বেশ নাম হয়ে গেল। তিনিও ঘড়ি সারানোর জন্যে প্রায়ই কোলকাতার বড় বড় লোকেদের বাড়ীতে যেতে থাকলেন। নিজের দেশেরই হোক বা এ দেশেরই হোক ডেভিড সবায়ের সঙ্গেই মিশতেন, মিষ্টি ব্যবহার করতেন—যে আলাপ শুরু হতো একবার, তাকে নানাভাবে আরও ঘনিষ্ঠ, আরও নিবিড় করে তুলতেন।

এই সঙ্গে ডেভিডের মুখে একটা কথা সবাই—প্রায় রোজই শুনতে পেতেন। তিনি—বিশেষ করে এদেশীয় লোকদের, বলতেন ঃ

আপনারা সব এমন ভাবে দিন কাটান কেন? লেখাপড়ায় আপনাদের তেমন আগ্রহ নেই কেন? আপনাদের দেশ কত বড়, কত সুন্দর, আপনারাও সবাই কত ভালো, তবু আপনাদের এমন অবস্থা কেন?

কখনও—আরও একটু বেশী বন্ধুত্ব যাঁদের সঙ্গে হতো—তাঁদের বলতেন ঃ আপনারা যদি এমন হন, আপনাদের শিক্ষা স্বভাব যদি এমন হয়, তবে আপনাদের ছেলেমেয়েদের—যারা আপনাদের ভবিষ্যৎ বংশধর—তাদের কি হবে?

তিনি এমন বলবেন না-ই বা কেন! সেকালের কোলকাতায় কিছুদিন থাকার পরেই হেয়ার সাহেব যে সমস্ত বাবুদের সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতালেন—যাঁদের সঙ্গে আলাপ হলো, তাদের বাড়ীতে একটা না একটা আমোদ লেগেই থাকতো। সারা দিন হাড়-ভাঙ্গা খাটুনির পর সন্ধ্যে বেলায় বাড়ী ফিরে একটু বিশ্রাম ও গোছগাছ করে নিয়ে ডেভিড রওনা দিতেন ঃ কারও বাড়ী বাঈ নাচ হচ্ছে, কোথাও বা যাত্রা। কারোর বাড়ী কবি হচ্ছে—কেউ বা আখড়াই অথবা খেম্‌টা নাচের আসর বসিয়েছে—সব রকম আমোদ-ফূর্তির আসরে দেখা যাবে দীর্ঘদেহী, উন্নত বক্ষ, হাস্যমুখর হেয়ার সাহেবকে।

রবিবার বা ছুটির দিন কারুর বাড়ীতে শুরু হয়ে যেত বুলবুলির লড়াই —কোথাও সুতোয় নোট বেঁধে ঘুড়ি ওড়ানো—কোথাও বা লাখ টাকা খরচ করে বেড়াল বা বাঁদরের বিয়ে। ডেভিড সব জায়গাতেই যেতেন, সবার সঙ্গেই মিশতেন—আমোদে-আহ্লাদে যোগ দিতেন দরাজভাবে। এই সব ছাড়াও তখনকার কোলকাতায় আরও কত রকমের কৌতুকপ্রদ স্ফূর্তি-ফার্তার ব্যবস্থা যে ছিল তার একটু নমুনা এখনকার লোকেদের কিছু জানানো দরকার।

তখনকার একটা বই থেকে এখনকার ভাষায় একটু তুলে দেওয়া যাক ঃ

—তখনকার কোলকাতায় কত ধরণেরই না মজা লোটার আসর বসতো। কোনো কোনো জায়গায় সন্দেশের মজলিশ বসতো। অর্থাৎ বাজী ধরে সন্দেশ খাওয়া। কারুর বাড়ীতে গোল্লা বিছিয়ে তার ওপর বসে বৈঠকী গান হতো। কোনো স্থানে 'মানুষ-পাখী'র সভা বসতো। অর্থাৎ বড় বড় খাঁচার ভেতর মানুষ-পাখীরা থাকতেন। সেই খাঁচা শুদ্ধ তাদের সভায় নিয়ে আসা হলে কেউ কাক, কেউ কাদাখোঁচা, কেউ সারস, কেউ বক এই রকম নানা ধরণের পাখীর গলার আওয়াজ,—ধরণ-ধারণের নকল করতেন। কোন মানুষ-পাখী আবার মাঝে মাঝে গান জুড়ে দিতো ঃ

'—কুরুড় কিং ল্যাক্ জ্যাকসন'

'—গুলবর জ্যাকসন—কু-রু-ড়'

'—আলিপুরি জ্যাকসন—কুরুড়।' 'কু-ড়ু-কু—'

তেল যেমন জলের সঙ্গে মেশে না—রাজহাঁস যেমন জলে ডুবে যায় না, হেয়ার সাহেবও তেমনি এই আনন্দের—স্ফূর্তির—মজলিসের মধ্যে থেকেও সব সময়েই তাঁর উচ্চ মন, আর মহৎ হৃদয়টিকে ভাসিয়ে রাখতেন। এই সবের ভেতরে বসেও,—সভা-বৈঠকের রোশনাই-এর মধ্যে থেকেও হেয়ার তাঁর পাশের অন্ধকারটিকে স্পষ্ট দেখতে পেতেন।

আর পেতেন বলেই যখনই এদেশীয় লোকেদের সঙ্গে দেখা হতো বা আলাপ-আলোচনা করতেন তখনই তাঁদের ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ার কি হবে—তাদের ভবিষ্যৎ কেমনভাবে গড়ে উঠবে তার প্রসঙ্গ তুলতেন।

এ-এক অদ্ভুত মাথা-ব্যথা। নিজের ছেলে-পুলে নেই। ঘর-সংসার হয় নি। অন্যের ছেলে-মেয়েদের ভাবনায় অস্থির। তাও আবার, বিজাতীয়—বিধর্মী এবং বিদেশী। কিন্তু হলে কি হবে। সেই যে কথায় আছে ঃ স্বভাব যায় না মলে .....। তার যা স্বভাব।

আর হবে না-ই বা কেন। দেশে লেখাপড়ার যা ছিরি। টোল-চতুষ্পাঠী-মাদ্রাসা রয়েছে অবশ্য। যারা সংস্কৃত-আর্বী-ফার্সী শিখতে চায় তারা সেখানে তা শেখে। কিন্তু সেও প্রয়োজনের তুলনায় খুবই কম। সেখানে 'সকলের জন্যে লেখাপড়া'র ব্যবস্থা নেই। নানা হাঙ্গামা নানা খরচ ; আর সব চেয়ে বড় হলো সে-সব ভীষণ কঠিন। বাঙ্গালীর ছেলে ঐ সব ভীষণ ভীষণ ভাষা লিখতে গিয়ে নাজেহাল হয়ে পড়ে—দুধে দাঁত দিয়ে কি আর লোহার কড়াই চেবানো যায়।

এই সব কিছুই হেয়ার সাহেব বুঝছেন। তিনি দেখছেন ঃ

—যে ভাবে দেশে লোক-সংখ্যা বেড়ে চলেছে তার তুলনায় টোল-পাঠশালা গুনতিতে খুবই কম।

—ইংরেজ দেশের রাজা হয়ে বসেছে ;—এই সত্যকে আর কোনো ক্রমেই পালটানো যাবে না। তাই রাজভাষা শেখা এখন সব দিক থেকেই দরকার। এতে দেশের লোকেরও উপকার হবে এবং রাজা ইংরেজেরও রাজত্ব চলানোয় সুবিধে হবে।

অন্যদিকে স্বাভাবিক নিয়মেই সংস্কৃত-আর্বী-ফারসীর প্রয়োজন বা ব্যবহার কমে আসছে। আবার বাঙ্গালীর ছেলে বাংলাও জানে না। জানানোর কোনো ব্যবস্থাও নেই—সব দিক থেকেই বাংলা-মা সূতিকা রোগগ্রস্থা—জীর্ণ-শীর্ণ-রক্তহীন।

—এমন কি সাহেবদের সঙ্গে মিশে, থেকে, কাজ করে—এদেশীয়রা যে ইংরেজী শিখছে বা শিখেছে তাতে 'ইয়েস—নো—ভেরি গুড' গোছের কাজ চলে, কিন্তু ইংরেজী ভাষা-সাহিত্য ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিপুল বারিধি পাড়ি দিতে ঐ ফুটো পানসীতে কুলোবে কেনো। তাই হেয়ার সাহেবের ছটফটানি—আকুলতা ও আগ্রহ।

এই সময়ের লেখাপড়া শেখার যে ব্যবস্থা তার ছবিটি এই রকম ঃ

'বাঙ্গালিদের মধ্যে বাংলা কি ইংরেজী কিছুই উত্তমরূপে অনুশীলিত হইতেছে না—স্থানে স্থানে যে পাঠশালা ছিল তাহা দেখিয়া এই স্থির করিলেন যে পাঠ্যপুস্তকের অভাব। ছাত্রেরা কেবল কিঞ্চিৎ অঙ্ক-বিদ্যা, পত্র লেখা, জমা ওয়াসিল বাকি, গুরুদক্ষিণা ও গঙ্গার বন্দনা শিখিতেছে, কিন্তু শুদ্ধ লেখনে ও কথা কহিতে অক্ষম। ইংরাজীও সামান্য রূপে শিক্ষা হইতেছে। ভাল পুস্তক নাই, ভাল শিক্ষক নাই।' এ এক দারুণ অভাব। এই সঙ্গে আরও একটি জিনিষের অভাব দেখা দিয়েছে, তা-হচ্ছে নৈতিকতার।

ইংরেজের নতুন ব্যবসা, রাজত্ব ও রাজধানীর সূত্রে কোলকাতায় কাঁচা পয়সা এবং নানা ধরণের লোকের আনাগোনা। সাহেবরাও সবাই হেয়ার নন। তাই সব দিক থেকেই—আমোদ-প্রমোদের মধ্যে দিয়ে—বিশেষ করে দেশীয় লোকদের স্বভাব ও রুচি, ভীষণ হয়ে উঠেছিলো। তখন অবশ্য মদ খাওয়ার রেওয়াজ এতোটা বাড়ে নি, তবে গাঁজা ও চরসের চলনটা ছিল মাত্রাতিরিক্ত ভাবে বেশী।

সে-দিনকার ছবিটার এই ভাব ঃ

ধর্মতলার উত্তর দিকের কোলকাতাটা অর্থাৎ বাগবাজার, চিৎপুর, শোভাবাজার, পটলডাঙ্গা, বেনেটোলা, হাতিবাগান, গোয়াবাগান নিয়েই কোলকাতা। এখানে তখনও স্থায়ী বাসিন্দাদের ভীড় খুবই কম। সকলের কাছেই কোলকাতা ছিলো টাকা রোজগারের জায়গা—চাকুরীস্থল। দেশের বাড়ীতে থাকতো পরিবার পরিজন, আর

নিজেরাও কোলকাতায় বাসা করে থেকে রোজগার করে সপ্তাহে—মাসে বা ছুটি-ছাটাতে ছুটতেন দেশের বাড়ীতে।

'সে-কালে কর্মস্থানে পরিবার সঙ্গে লইয়া যাইবার রীতি ছিল না। কলিকাতাতে যাঁহারা বিষয় কর্ম করিতেন, তাঁহারা সচরাচর হয় কোনও পদস্থ আত্মীয়ের আশ্রয়ে, না হয় দুই-দশজনে একত্র হইয়া বাসা করিয়া থাকিতেন। গ্রামের মধ্যে এক ব্যক্তি কৃতী ও উপার্জনশীল হইলে তাঁহার জ্ঞাতি কুটুম্বদিগের মধ্যে অনেকে একে একে আসিয়া তাঁহার কলিকাতাস্থ বাসাতে আশ্রয় লইতেন। কেহ বা কর্মের আশায় নিষ্কর্মা বসিয়া খাইতেন। কেহ বা কাজকর্ম করিয়া সামান্য উপার্জন করিতেন। এরূপ ব্যক্তিদিগের অন্নদান করা ভদ্র-গৃহস্থ মাত্রেরই একটা কর্তব্যের মধ্যে পরিগণিত ছিল। অধিকাংশ-স্থলেই পাকাদি কার্যের জন্য স্বতন্ত্র পাচক রাখা হইত না। এই অন্নাশ্রিত বা নিষ্কর্মা ব্যক্তিগণই পালা করিয়া রন্ধনাদি করিতেন। তাহা লইয়া সময়ে সময়ে ঘোর বিবাদ উপস্থিত হইত। একজনের কাজ অপরে করিতে চাহিত না। আপনাদের মধ্যে কোনও অল্প-বয়স্ক বালক থাকিলে অধিকাংশ বাসার নিষ্কর্মা ব্যক্তিগণ তিরস্কার ও তাড়নাদির প্রভাবে তাহাদিগকে বশবর্তী করিয়া তাহাদিগের দ্বারা অধিকাংশ কাজ করাইয়া লইবার চেষ্টা করিত।'

কোলকাতায় বাসা বাঁধা এই সব কুঁড়ে-বেকার লোকেদের স্বভাব-চরিত্রের কথা যত কম বলা যায় ততই ভালো। গ্রামে লেখাপড়া শেখবার কোনো ব্যবস্থা নেই। কোলকাতায় লেখাপড়া শেখার, বিশেষ করে ইংরেজী শেখার ব্যবস্থা হচ্ছে,—তার সঙ্গে লেগে থেকে যদি কোনো রকমে গোটা কয়েক ইংরেজী শব্দ শেখা গেল তবে টাকা রোজগারের পথটাকে আটকায় কে? এই সমস্ত দেখে গ্রাম থেকে অনেকেই তাদের ছেলে-ভাই-আত্মীয়দের কোলকাতায় নিয়ে আসতেন, মানুষ করানোর উদ্দেশ্যে। কিন্তু সেই সব শিশুমতি

বালকেরা এসে আশ্রয় পেতো ঐ সমস্ত বেকার-নেশাড়ু লোকেদের কাছে। ফলে যা হতো তা আর না বলাই ভালো। সেখানের এই সব 'মানুষ' হয়ে ওঠা বালকদের যে ছবি দেখতে পাচ্ছি, তা-হচ্ছে ঃ

'বালকদিগের রুচি, আলাপ, আমোদ, প্রমোদ সমুদয় কলুষিত হইয়া যাইত। বয়ঃপ্রাপ্ত পুরুষদিগের অসঙ্কুচিত আলাপ ও ইয়ারকির মধ্যে বাস করিয়া তাহারা অকালপক্ব হইয়া উঠিত। তাহাদের বয়সে যাহা জানা উচিত নয়, তাহা জানিত ও তদনুরূপ আচরণ করিত। অনেকে ফিনফিনে কালাপেড়ে ধুতি পরিয়া, বুট পায়ে দিয়া, দাঁতে মিশি লাগাইয়া ও বাঁকা সিঁতে কাটিয়া সহরের বাবুদের অনুকরণের প্রয়াস পাইত; চরস-গাঁজা প্রভৃতি খাইতে শিখিত, এবং অনেক সময়ে তদপেক্ষাও গুরুতর পাপে লিপ্ত হইত।'

এদের দেখেই হেয়ার সাহেবের আতঙ্ক হতো। ভয় হয়তো আরও অনেকের হতো, কিন্তু কি করা যায় তা তারা বুঝতে পারতো না। এবং এই ভয়, যখন কোলকাতায় এসে হেয়ার প্রতিষ্ঠা লাভ করছেন কেবল তখনই নয়—অনেক পরেও যখন আরপুলি, কলুটোলা, পটলডাঙ্গায় স্কুল তৈরী হয়ে গেছে তখনও তাঁর ছাত্রদের সম্পর্কে তিনি পেতেন। তখনকার কোলকাতার এই বিষাক্ত সংসর্গ থেকে স্কুলের ছেলেদের বাঁচাবার জন্যে কি প্রখর ও সতর্ক দৃষ্টিই না তাঁর ছিলো। পরে সে কথা বলা যাবে।

৩.

যে বছরে হেয়ার কোলকাতায় আসেন, সেই বছরেই কোলকাতায় ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের প্রতিষ্ঠা হয়। কিন্তু এই কলেজে দেশের সাধারণ লোক বা তাদের সন্তানদের পড়াবার কোনও ব্যবস্থা হয় নি। এর ছাত্র ছিলো সেই সমস্ত ইংরেজ রাজপুরুষেরা—যাঁরা সদ্য বিলেত থেকে এসেছেন, এই দেশ শাসন করার জন্যে। তাঁরা এখানে, এদেশীয় পণ্ডিত-মৌলভীর কাছে সংস্কৃত-আর্বী-ফারসী এবং সামান্য কিছু বাংলা শিখতো এবং আরও শিখতো দেশীয় আচার-ব্যবহার-সহবত······ইত্যাদি।

এদের শেখাবার জন্যে এই কলেজ থেকে কয়েক বছরে কিছু বাংলা বইও বেরুলো। কিন্তু সেগুলোও সারা দেশের—এমনকি কোলকাতার ছাত্ররাও ব্যবহার করতে পেরেছে বলে মনে হয় না। অর্থাৎ ফোর্ট উইলিয়মের শিক্ষা ঐ কলেজের চার দেওয়াল ছাড়িয়ে বাইরে যেতে পারে নি। তবুও বাইরের জগৎটাও একেবারে নিশ্চুপ ছিলো না,—তা থাকতে পারেও না। বাইরে থেকে বোঝা না গেলেও ইঁটের পাঁজার আগুন জ্বলতেই থাকে।—সবার অলক্ষে কখন যে ডাবের ভেতর জল সঞ্চার হয়ে যায় তা বোঝাও যায় না। ঠিক তেমনিই ডেভিড এদেশের মাটিতে পা দেওয়ার আগে থেকেই ভেতরে ভেতরে, কখনো কখনও বাইরে বাইরেও দু-চারটে ঘটনা—কিছু কিছু ভাঙ্গা-গড়া চলছিলই। ডেভিড আসার পরেও যে আট দশ বছর সময় লেগেছিল এদেশে তাঁর ব্যবসা জমাতে, টাকা করতে, গোলদীঘির আশেপাশের অনেকখানি জমির মালিক হতে, সে সময়েও একটা ছটফটানি চলছিলই। ডেভিডের দরদী মন—সজাগ দৃষ্টি এবং তীক্ষ্ণ

বুদ্ধির ক্যামেরায় সবই খুব নিখুঁতভাবে ধরা পড়ছিলো। তিনিও সব কিছু মিলিয়ে ক্রমেই অস্থির হয়ে পড়ছিলেন। যেমন ঃ

১৭৯৪ খ্রীস্টাব্দে কোলকাতায় সুপ্রীম কোর্ট তৈরী হলো। সাহেবরা এর বিচারপতি। কেউ কেউ উকীল-মোক্তারও। ইংরেজী-বাংলা মিলিয়ে কথাবার্তা, কাজকর্ম চালানোয় দেশীয় লোকদের প্রয়োজন হচ্ছে। ঐ সব সাহেব উকীল-মোক্তারদের কেরাণী হতে পারলে বেশ দুপয়সা রোজগার হয়। নানা রকম সুযোগ-সুবিধেও পাওয়া যায়। তাই তারা নানা উপায়ে—রোজকার কাজে লাগে যে কথাগুলি, তার ইংরেজী শিখে রাখতো। তবে এই শেখায় ইংরেজী ব্যাকরণ, কাব্য, বা রচনার বড় একটা ধার কেউ ধারতো না। যে যত বেশী ইংরেজী শব্দ শিখতে পারতো, সে তত বড় পণ্ডিত হিসেবে খাতির পেতেন। এবং স্থানে-অস্থানে এই সব ইংরেজী শব্দ ব্যবহার করে লোকের কাছ থেকে সম্মান আদায় করা হতো। সেকালে এইরকম একজন ইংরেজী জানা পণ্ডিত ছিলেন রামরাম মিশ্র।

তাল বুঝে অনেকে আবার এই রকম ইংরেজী শেখার স্কুলও খুলে দিয়েছিলেন। যেমন ঃ 'রামমোহন নাপিতের স্কুল', 'কৃষ্ণমোহন বসুর স্কুল', 'শিবু দত্তর স্কুল' এই সব। এর থেকে সার্টিফিকেটও পাওয়া যেত ঃ 'অমুক চন্দ্র অমুক একশ বা দুশ বা তিনশ ইংরেজী শব্দ শিখেছে।'

এই সব ব্যাকরণজ্ঞানহীন বাক্য-রচনা, বোধশূন্য ইংরেজী শব্দ শিখিয়েরা ইংরেজদের সঙ্গে যেভাবে কথাবার্তা চালাতেন তা-নিয়ে অনেক মজার মজার গল্প আছে। এখানে তার একটা দেওয়া হলো ঃ

কোনোও একজন ইংরেজের কাছে একজন বাঙালী কেরানী কাজ করতেন। তিনি রোজ দুপুরে সাহেবের ঘোড়ার দানা চুরি কোরে টিফিন করতেন। এর দেখাদেখি দুষ্ট সহিসেরা ঘোড়ার দানা চুরি করে বিক্রি করে দিতো। সাহেব একদিন সহিসদের চুরি ধরে ফেলেন।

তখন সহিসেরা বলে: 'হুজুর আপনার কেরানীবাবু রোজ রোজ ঘোড়ার দানাতে টিফিন করেন।' সাহেব আশ্চর্য হয়ে ঐ বাবুকে এমন করার কারণ জিজ্ঞাসা করলে তিনি ইংরেজীতে সাহেবকে জানালেন: 'Yes Sir ; My house morning and evening twenty leaves fall, little little pay, How manage ?' মানে: 'আমার বাড়িতে সকাল-সন্ধ্যে কুড়িটি পাতা পড়ে, অল্প মাইনে, আমি কেমন করে চালাবো ?'

এরকম প্রচণ্ড ইংরেজী শুনে সাহেব নাকি খুশি হয়ে ঐ কেরানীবাবুর মাইনে বাড়িয়ে দিয়েছিলেন।

এইভাবে ১৮১১ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত গেল। সব কিছুই কোনো রকমে গড়িয়ে গড়িয়ে চলছে। দেশীয় লোকদের মধ্যেও তেমন কাউকে পাওয়া যাচ্ছে না যে জোর করে একটা ধাক্কা লাগায়। ভোর হচ্ছে—ঘুমের ঘোর পাত্‌লা হয়ে এসেছে—দরকার শুধু একটু জাগিয়ে তুলে বসানো। এমন সময় এই বছরেই সেই সময়ের ভারতে গবর্ণর জেনারেল লর্ড মিণ্টো দেশীয় শিক্ষা, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সাহিত্যের উন্নতির জন্যে [যদিও সংস্কৃত] গবর্ণমেণ্টের খাতাপত্তরে নাড়াচাড়া দিতে লাগলেন। কিন্তু তাও ঐ পর্যন্ত। আরও বছর দুই গেল। শেষে ১৮১৩ খ্রীস্টাব্দে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি এদেশের গবর্ণমেণ্টকে লিখিতভাবে নির্দেশ দিলেন যে: প্রত্যেক বছর কম করে এক লাখ টাকা সমস্ত খরচের বাইরে রাখতে হবে যা দিয়ে ভারতবর্ষের ব্রিটিশ প্রজাদের মধ্যে জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রচার করতে এবং তার উন্নতির ব্যবস্থা করা হবে। কিন্তু এতেও বিশেষ কাজ হলো না।

এমন সময়ে দুটি ঘটনা ঘটলো। তার প্রথমটি হচ্ছে ১৮১৩ খ্রীস্টাব্দের ১১ই নভেম্বর কোলকাতার সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি হয়ে এলেন সার হাইড ইস্ট [Sir Hyde East] এবং ১৮১৪ খ্রীস্টাব্দে বেয়াল্লিশ বছর বয়সে রামমোহন কোলকাতায় এলেন স্থায়িভাবে

বসবাস করতে। রামমোহন এর আগে নিজের দেশ থেকেই [হুগলীর রাধানগর] ধর্ম ও সমাজের পুরানো ভাবধারা সম্বন্ধে নতুন করে ভাবতে শুরু করেছেন,—কড়া কড়া কথা বলতে আরম্ভ করেছেন। যার ফলে তিনি কোলকাতার সমাজেও একেবারে অপরিচিত ছিলেন না। সঙ্গে ছিল পৈত্রিক এবং নিজের রোজগারের অনেক টাকা।

হাইড ইস্ট বিচারালয়ের বাইরে এদেশের একজন হিতৈষী ব্যক্তি ছিলেন। প্রথম দিকে প্রত্যক্ষ ভাবে এদেশের কোনো প্রতিষ্ঠান বা সমাজ আন্দোলনের সঙ্গে যোগ না রাখলেও তিনি যে তাঁর সদিচ্ছা ও অন্তরঙ্গ ব্যবহারের দ্বারা কোলকাতার প্রতিষ্ঠাবান ও শিক্ষিত জনসমাজের কাছে পরিচিত ছিলেন তা বুঝতে অসুবিধা হয় না। তা-যদি না হবে তবে তিনি কোলকাতায় আসার দু-বছরের মধ্যেই তাঁর কাছে এদেশে শিক্ষা বিস্তারের ব্যাপারে সাহায্য চেয়ে প্রস্তাব পাঠানো হবে কেন? আর ঘড়ির ব্যবসা বা অন্যান্য সূত্রে ইস্টের সঙ্গে হেয়ারেরও পরিচয় বেশ ঘনিষ্ঠ ছিল এ খবরও পাওয়া যাচ্ছে।

অন্যদিকে রামমোহনও কোলকাতায় এসে সারকুলার রোডে একটি বাড়ী তৈরী করে বাস করতে থাকলেন। নিজের ইজারাদারীর সূত্রে, পাণ্ডিত্যগুণে ও তীক্ষ্ণবুদ্ধি দিয়ে তিনি এদেশে বাস করছেন এমন ইংরেজদের, গণ্যমান্য বাঙ্গালীদের সঙ্গে খুব অল্পদিনেই বন্ধুত্ব পাতিয়ে ফেললেন। হেয়ার সাহেবও তাঁর বন্ধুদের মধ্যে একজন। ইংরেজী কায়দায় সাজানো রামমোহনের সারকুলার রোডের বাড়ীতে যে সমস্ত মজলিশ-আলোচনা-খানাপিনার আসর বসতো তাতে দেশী-বিদেশী বাবু ও সাহেবদের সঙ্গে ডেভিড হেয়ারকেও দেখা যেত।

এই সমস্ত সভা-মজলিশে রামমোহন বা অন্যেরা সেই সময়ের লোকেদের সংস্কার, আচার-ব্যবহার, মূর্তিপূজার বাড়াবাড়ি, এই সব নিয়ে মিঠেকড়া আলোচনাও করতেন। রামমোহন জোর দিতেন বিদ্যা শিক্ষার ওপর—তিনি বলতেন হিন্দু ধর্মের যে সব বই আছে,

যেমন বেদ-উপনিষদ ইত্যাদি তা সবায়ের পড়ার দরকার। সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজী শেখারও যে প্রয়োজন, রামমোহনের সঙ্গে অন্য সকলেও তা স্বীকার করতেন।

রামমোহন ছিলেন গণ্ডগোলের লোক। দেশে থাকতেই নানা ধরণের গণ্ডগোলের সূত্রপাত করেছেন। এমন কি মায়ের সঙ্গেও এই নিয়ে ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে ;—এখন কোলকাতায় এসে তো পোয়া বারো। তাঁর সঙ্গীও জুটেছেন যাঁরা—গোপীমোহন ঠাকুর, দ্বারকানাথ ঠাকুর, বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়, জয়কৃষ্ণ সিংহ, কাশীনাথ মল্লিক, রাজা বদনচন্দ্র রায়—তাঁরাও তেমনি। এঁদের সঙ্গে নিয়ে রামমোহন কোলকাতায় গণ্ডগোলের ঢেউ তুললেন। মৌচাকে একের পর এক ঢিল পড়তে লাগলো। তিনি বলতে লাগলেন মেয়েদের স্বামী মারা যাবার পর স্বামীর চিতায় জ্যান্ত পুড়িয়ে মারা, যাকে সতীদাহ বলে,—তা চলতে পারে না। শাস্ত্রের কোথাও এর সমর্থন নেই। পুতুল পূজো করতে হবে এ বিষয়েও বেদ বা উপনিষদ কিছু তেমন বলেন না—অতএব পুতুল পূজো তুলে দিলেই হয়। তা-ছাড়া যে হিন্দু শাস্ত্রের নাম ভাঙ্গিয়ে ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতেরা করে খাচ্ছেন তার বাংলা অনুবাদ ছাপিয়ে বাজারে বিক্রির ব্যবস্থা করতে হবে। যে কথা সেই কাজ। এই রকম প্রথম দু-খানি বই বেরুলো তাঁর কোলকাতায় আসার এক বছরের মধ্যেই—১৮১৫ খ্রীস্টাব্দে। বই দুটি হচ্ছে 'বেদান্ত গ্রন্থ' এবং 'বেদান্তসার, অনুবাদ ও ব্যাখ্যা'। যে গায়ত্রী মন্ত্র এতদিন কেবল ব্রাহ্মণেরাই জানতেন—শূদ্রের শুনলেই পাপ বা মৃত্যু, সেই গায়ত্রীকেও তিনি প্রকাশ করে দিলেন। সারা দেশ জুড়ে 'গেল' 'গেল' রব উঠলো। সনাতন হিন্দুধর্ম এবারে সত্যিই রসাতলে গেল। ঘোর কলিকাল উপস্থিত হয়েছে। রামমোহন হতভাগাটাই সব নষ্টের মূল। ও পাষণ্ডের মুখ দেখাও পাপ। সারা বাংলা দেশের যেখানে যাও কেবল রামমোহনের কথা। বাবুদের বৈঠকখানায়, ভট্টাচার্যের

চতুষ্পাঠীতে, পাড়াগাঁয়ের চণ্ডীমণ্ডপে এমন কি বাড়ীর অন্দরমহলেও রামমোহনের কীর্তিকলাপের রকমারি রঙদার আলোচনা।

রামমোহন হিন্দু শাস্ত্র বা বঙ্গীয় হিন্দু সমাজকে কেবল ধাক্কা দিয়েই ক্ষান্ত হলেন না। এই বিষয়ে তাঁর কাজকেও তিনি একটা রীতিতে বেঁধে ফেললেন। তাঁর সমস্ত কাজের ধারাকে চার ভাগে ভাগ করা হলো ঃ প্রথম, কথোপকথন ও তর্কবিতর্ক। দ্বিতীয়, বিদ্যালয় তৈরী করে বা অন্যভাবে দেশের লোককে শিক্ষিত করে তোলা। তৃতীয়, বই লিখে, ছাপিয়ে লোকের মধ্যে প্রচার করা। এবং চতুর্থ হচ্ছে সভা-স্থাপন করা।

প্রথমেই আরম্ভ হলো তর্ক-বিতর্ক ও কথোপকথন। এ বিষয়ে সবচেয়ে আদর্শ জায়গা হলো তাঁর ব্যড়ী। কোলকাতার অন্যত্রও যে এই ব্যবস্থার আয়োজন হয়নি এমন নয়। এর সঙ্গে বই ছাপানোর কাজও তিনি চালু করেছিলেন। তা আগেই বলেছি। একটা সভা বা স্থায়ী প্রতিষ্ঠান তৈরীর বিষয়েও তিনি চিন্তা করছিলেন এবং কোলকাতা বাসের পরের বছরেই অর্থাৎ ১৮১৫ খ্রীস্টাব্দেই তাঁর মাণিকতলার বাড়ীতে 'আত্মীয় সভা' নামে একটি সভার পত্তন হয়। এবং শেষ যে ব্যবস্থা অর্থাৎ বিদ্যালয় তৈরী করা, তারও চেষ্টা করতে লাগলেন তিনি, কিন্তু প্রত্যক্ষভাবে সে বিষয়ে বিশেষ কিছু সুবিধে করে উঠতে পারছিলেন না। এমন সময় একদিন সে সুযোগও এসে হাজির হলো এবং নিয়ে এলেন একজন বিদেশী,—ইংরেজ—যিনি আমাদের পরম প্রিয়—ডেভিড হেয়ার। ঘটনাটা বলি,—এবং তা বলবার জন্যেই রামমোহনের কথা একটু বেশী করে বলতে হলো।

আগেই বলেছি—হেয়ার অনেকদিন থেকেই চাইছিলেন যে এদেশের ছেলেদের জন্যে সত্যিকারের ভালো ইস্কুল হোক,—যেখান থেকে তারা ইংরেজী শিখতে পারে, নিজেদের মাতৃভাষা শিখতে পারে। এবং তা যদি পারে তবে রামমোহন বা অন্যদের তৈরী আন্দোলনকে

সঙ্গে নিয়ে—নির্বুদ্ধিতা ও অজ্ঞতার যে পাহাড় জমেছে তাতে জোরসে ধাক্কা লাগাতে পারে। এই চিন্তা থেকেই ১৮১৬ সালে হেয়ারের চেষ্টায় ব্যাপারটা পাকিয়ে উঠলো। আসলে সবই প্রায় তৈরী ছিল—তেল-ভর্তি প্রদীপ, সলতে, পিলসুজ—শুধু প্রয়োজন একটা দেশলাই কাঠি জ্বেলে দেওয়ার, হেয়ার সেই ছোট্ট অথচ সবচেয়ে প্রয়োজনীয় কাজটি করে দিলেন।

সপ্তাহে দুদিন করে 'আত্মীয় সভা'র অধিবেশন বসতো রামমোহনের বাড়ীতে, কখনও বা বৃন্দাবন মিত্রের বাড়ীতে, কখনও বা রাজা কালীশঙ্কর ঘোষালের বাড়ীতে, আবার কখনও বা তুলা বাজারে বিহারীলাল চৌবের বাড়ীতে। সভা স্থাপন হওয়ার এক বছর পরে অর্থাৎ ১৮১৬ খ্রীস্টাব্দের এপ্রিলের শেষ বা মে মাসের গোড়ার কোনোও সময় এক আলোচনায় হেয়ার সাহেব বিনা নেমতন্নেই হাজির ছিলেন। হেয়ারের স্বভাবই এই। তিনি এদেশের শিক্ষা-সংস্কৃতিকে এত ভালো-বাসতেন যে যেখানেই তার অনুষ্ঠান হতো তিনি গিয়ে হাজির হতেন। মান-অপমান, লজ্জা বা নেমন্তন্ন-আহ্বান কিছুরই অপেক্ষা করতেন না।

ঐ সভায় রামমোহন ধর্ম সম্বন্ধে অনেক আলোচনা করলেন। এদেশের-ওদেশের ধর্মের মধ্যে অনেক তুলনা করলেন। হিন্দু ধর্মের মধ্যে কোথায় গলদ, কোথায় ভাল তারও আলোচনা হলো। ইংরেজদের খ্রীস্টান ধর্মের গলদ নিয়েও কথা উঠলো। শেষে রাম-মোহন সবচেয়ে জোর দিলেন পৌত্তলিকতা উচ্ছেদের ওপর। তিনি জোর দিয়ে বললেন ঃ আমি আগেও বলেছি এবং এখনও বলছি যে এর জন্যে একটা 'বেদান্ত বিদ্যালয়' স্থাপন করতে হবে।

হেয়ার চুপ করে একধারে বসে সব শুনছিলেন। কোনও মতামত দিচ্ছিলেন না। তাঁর স্বভাবের মধ্যে এও একটা বড় অভ্যাস। কোনও

দলাদলির পক্ষই নিতেন না। সকলের সঙ্গে মিশতেন, সকলের সকল রকম কথা শুনতেন, তারপর যেটা নিজে ভাল বুঝতেন সেইটা করতেন। ফলে কেউ-ই তাঁকে তাদের বিপক্ষের লোক ভাবতেন না। সত্যিকারের কর্মীর শ্রেষ্ঠ গুণ এইভাবে হেয়ারে বর্তেছিলো।

যাই হোক, সব আলোচনা শেষ হলো। সভাও ভেঙ্গে গেল। এমন সময় ওঠার মুখে হেয়ার সাহেব প্রধানত রামমোহনকে উপলক্ষ করে বললেন ঃ

—সবই যেন হলো, আর যে সমস্ত কথা বললেন তাও তো মিথ্যে নয় ; কিন্তু এখন কথা হচ্ছে যে এই সমস্ত চিন্তাকে সার্থক করতে হলে দেশের লোককে লেখাপড়া শেখাতে হবে। বিশেষ করে feature generation অর্থাৎ যারা আসছে তাদের মধ্যে জ্ঞানের আলো জ্বালাতে হবে। আর এর জন্যে দরকার দেশে স্কুল তৈরী করা—যেখানে বেশি করে শেখাতে হবে ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্য, জ্ঞান এবং বিজ্ঞান। রাজা, তবেই আপনার চেষ্টা সার্থক হবে। এবং এই জন্যেই আমি আপনার বেদান্ত বিদ্যালয়ের বিরোধিতা আগেও করেছি এখনও করি।

হেয়ারের এই কথা শুনে রাজা ঘাড় নাড়লেন। বললেন ঃ

—সাহেব আপনি যা বলেছেন তা খুবই ঠিক। আমিও একথা বুঝি! তাছাড়া আপনি আগে তো আরও কয়েকবার এই স্কুল খোলবার কথা বলেছেন। কিন্তু খুলি কি করে। কারণ আপনি তো জানেন যে দেশের লোক আমাকে কি চোখে দেখে। তাই আমি স্কুল খুললে সেখানে কি কেউ পড়তে আসবে?

হেয়ার উত্তর দিলেন ঃ এ কথা বহুত ঠিক। কিন্তু, একেবারে চুপ করে বসে থাকাও তো যায় না। একটা কিছু তো করতেই হবে।

এমন সময় ভাগ্যক্রমে সেই সভায় সেদিন উপস্থিত ছিলেন বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়। ইনি একালের বিখ্যাত বিচারপতি অনুকূল

মুখোপাধ্যায়ের ঠাকুরদাদা। এই বৈদ্যনাথ ছিলেন এক সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ পরিবারের সন্তান। তাঁর পৈতে অর্থাৎ বংশ মর্যাদা ছিলো তাঁর গর্বের বস্তু। তবুও তিনি রামমোহনের 'আত্মীয় সভা'য় বা তাঁদের তর্কাতর্কি শুনতে প্রায়ই আসতেন। এ সব ছাড়াও বৈদ্যনাথের আরও একটা বড় কাজ ছিলো,—তখনকার দিনের কোলকাতার বড় বড় ইংরেজ কর্মচারী—অর্থাৎ লাট-বে-লাট, জজ-ম্যাজিস্ট্রেট প্রভৃতির বাড়ী ঘুরে ঘুরে বেড়ানো। তাদের কাছে দেশের সব খবর দিতেন,—নিতেন। সাহেবরা কে কি ভাবছেন বা কোথায় কি করতে যাচ্ছেন তাও যেমন জেনে আসতেন, তেমনি দেশের ছোট বড় প্রজারাও ইংরেজ রাজত্ব সম্বন্ধে কি ভাবছে, তার সংবাদও তিনি দিয়ে আসতেন। অর্থাৎ এই মুখুজ্যের পো ছিলেন সেদিনের একটি চলমান গেজেট।

এখন এই সভায় রামমোহন ও হেয়ারের কথাবার্তা শুনে বৈদ্যনাথ বললেন : আমাদের সুপ্রীম কোর্টের যে নতুন বিচারপতি এসেছেন, তিনি লোক ভালো। তিনিও আপনাদের মতো চান যে এদেশের ছেলেরা ভাল করে নতুন দিনের উপযোগী লেখাপড়া শেখে। চান তো আমি তাঁর সঙ্গে এবিষয়ে কথা বলতে পারি। আপনাদের ইচ্ছাও তাঁকে জানাতে পারি।

বৈদ্যনাথের কথা শুনে সবাই একবাক্যে সায় দিয়ে উঠলো।

হেয়ার বললেন : আমরা এক্ষুনি রাজী। বলে, পাগল খাবি আয়—না হাত ধোবো কোথায়! এবিষয়ে আমরা এক পায়ে খাড়া হয়ে রয়েছি, আর মুখার্জিবাবু আপনি বলছেন 'আপনারা যদি রাজি থাকেন!'

অতএব, এ দিনের এই সভায় ঠিক হলো যে বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায় দু-এক দিনের মধ্যেই বিচারপতি ঈস্ট সাহেবের বাড়ী গিয়ে এদেশের ছেলেদের লেখাপড়া শেখার জন্যে স্কুল খোলানোর

কথাবার্তা বলবেন এবং এ বিষয়ে তিনি যে পরামর্শ দেবেন সেই অনুযায়ী ব্যবস্থাও নেওয়া হবে।

হেয়ার পেছনে থেকে চুপচাপ কাজ করতে ভালোবাসেন। রামমোহন এদেশের সমাজে পাষণ্ড ও বিধর্মী হিসেবে পরিচিত। হিন্দুদের ছেলেমেয়েদের জন্যে স্কুল—তাই হিন্দু এমন কেউ গিয়ে ঈস্টের সঙ্গে যোগাযোগ করুক এইটাই সকলের ইচ্ছে। তাছাড়া, বৈদ্যনাথের যেমন ঈস্টের সঙ্গেও পরিচয় আছে, তেমনি তাঁর পৈতেও খুব তেজীয়ান। ওদিকে ঈস্টের মতো এই রকম একজন উচ্চ পদের লোক যদি এদেশের সম্বন্ধে মাথা ঘামায় তা-হলে রাজকর্তৃপক্ষও বিষয়টির গুরুত্ব বুঝতে পারবেন—দেশীয় গণ্যমান্যেরাও ব্যাপারটাকে হতচ্ছেদ্দা করতে পারবেন না।

যে কথা সেই কাজ। বৈদ্যনাথ গিয়ে সব কথা ঈস্ট সাহেবকে জানালেন। ঈস্টের মনের ইচ্ছা-প্রদীপটি জ্বলে উঠলো। সব ব্যাপারটা শুনে তিনি খুব উৎসাহী হয়ে উঠলেন। বৈদ্যনাথকে বললেন ঃ বাবু, আপনি যা বললেন তাতে আমার খুব আনন্দ হলো। এখন আপনি যখন হিন্দু, তখন দেশের মাথা মাথা হিন্দুদের এই বিষয়ে কি মতলব তা জেনে আসুন। কেন না, হিন্দুদের দেশ এটা, হিন্দুদের জন্যে বিদ্যালয় হবে, তাই এতে তাদের মতটা কি, তা না জেনে তো কিছুই করা বা বলা যায় না। বিশেষ করে এ বিষয়ে আমরা কখনই কোনো জুলুম করবো না। তা-ছাড়া পেছনে যখন মিস্টার হেয়ার ও রামমোহনবাবু আছেন তখন ভাবনা কি ?

বৈদ্যনাথ মহাউৎসাহে জয়কৃষ্ণ সিংহ, রাধাকান্ত দেব, রামকমল সেন, দ্বারকানাথ ঠাকুর, মতিলাল শীল, মৃত্যুঞ্জয় তর্কালঙ্কার, জয়গোপাল তর্কালঙ্কার, প্রমুখ দেশের ধনবান-জ্ঞানবান ব্যক্তিদের মত জানবার জন্যে পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। সবাই এই রকম একটি সৎ কাজে যোগ দিতে রাজী। অনেকেই নানা ভাবে

উৎসাহ দেখালেন। হেয়ার ও রামমোহন সব ব্যাপারেই খবর পেতে লাগলেন।

ঈস্ট তখন সবায়ের মতকে একত্র করবার জন্যে ১৮১৬ খ্রীস্টাব্দের ১৪ই মে তাঁর বাড়ীতে দেশস্থ ভদ্র-জ্ঞানী-গুণী-ধনী-জনের একটি সভা ডাকলেন। সবাই মহাউৎসাহে সভায় হাজির হলেন। [এর চারদিন পরে ১৮ই মে ঈস্ট তাঁর প্রিয় বন্ধু জে. হ্যারিংটন সাহেবকে এক দীর্ঘ চিঠি দিয়ে এই সভার ঘটনা, উদ্দেশ্য ইত্যাদি সুবিস্তৃত ভাবে জানিয়েছিলেন।] এঁরা সকলেই গণ্যমান্য। দেশে-সমাজে সব দিক থেকেই এঁদের খাতির, নাম-ডাক। এই সভায় আরো এসেছেন দেশীয় পণ্ডিতেরা। তাঁরা টোল-চতুষ্পাঠিতে অধ্যাপনা করেন—কায়দাটা পুরাতন; তবুও চাইছেন যে রাজত্ব যখন পালটেছে বা পালটাতে যাচ্ছে তখন সেই রকম ভাবেই চলা ভাল। যুগের হাওয়ায় চলার চেষ্টা না করলে হয়তো পরে ঠকতে হবে। যখন যেমন, তখন তেমন—এটাইতো পণ্ডিতী বুদ্ধির সার কথা।

সভায় দাঁড়িয়ে একজন পণ্ডিত বললেনও এমনই কথা :

'—আমরা এককালে সুশিক্ষিত জাতি ছিলাম, এখানেও আমাদের মধ্যে এমন কেউ কেউ আছেন যাঁদের সুপণ্ডিত বলা যায়। কিন্তু সময় খুব তাড়াতাড়ি পালটাচ্ছে। আমাদের অবহেলায়, নানা সামাজিক ও রাজনৈতিক কারণে এদেশের প্রাচীন জ্ঞান-বিজ্ঞানের সমূহ অবনতি ঘটেছে এবং জ্ঞানের প্রদীপ প্রায় নিভেই এসেছে।

তবুও আমরা বিশ্বাস হারাই নি। আমরা আশা করি যে আমরা আবার শিক্ষাদীক্ষায় সমৃদ্ধ হয়ে উঠবো। এর জন্যে যে সুযোগের দরকার ছিল তার অভাব আজ ঘুচতে চলেছে—সভ্য ইংরেজরা একাজে এগিয়ে এসেছেন।'

বিচারপতি হাইড ঈস্টও সব শেষে জানালেন কেন এই সভা ডাকা হয়েছে। পরে তিনি এই দেশে আপাতত একটি ইংরেজী শিক্ষার

বিদ্যালয় তৈরীর খসড়া পরিকল্পনা সকলকে পড়ে শোনালেন। এর থেকে কি সুফল পাওয়া সম্ভব তা-ও জানালেন।

সকলেই এই কথায় একমত হলেন। এই রকম একটা বিদ্যালয় যে এখনই গড়ে ওঠার প্রয়োজন সে-বিষয়ে আর কারুরই দ্বিমত রইলো না।

এখন প্রশ্ন এলো টাকার। এরকম একটা প্রতিষ্ঠান তৈরী করতে হলে দরকার অনেক টাকার। ঈস্ট সাহেব সকলকে চাঁদা দেওয়ার প্রস্তাব দিতে সবাই রাজী হলেন। অনেক টাকা চাঁদা হিসেবে পাওয়ার আশ্বাস এলো। এমন কি, নানা কারণে সেদিন সভায় যাঁরা হাজির হতে পারেন নি, তাঁরাও চাঁদা দিয়ে বা অন্য ভাবে এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত থাকতে ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। সব দেখে শুনে বৈদ্যনাথ এবং ঈস্ট সাহেব খুবই আশান্বিত হয়ে উঠলেন। মনে হলো, —এবার একটা কিছু হবেই হবে।

সভা তো হলো। পূবের আকাশের অন্ধকার যেন একটু ফিঁকে হওয়ার উপক্রম হলো। কিন্তু দেখা গেল যে যিনি এই প্রত্যূষের 'প্রভাতী তারা' সেই ডেভিড হেয়ার সভায় নেই। বৈদ্যনাথের হাত দিয়ে সেই যে বিদ্যালয় তৈরীর খসড়াটা ঈস্টের কাছে পৌঁছে দিয়ে ঘাপটি মেরে রয়েছেন, তারপর আর তাঁকে সভায় দেখা যাচ্ছে না, কেবল এই সভাতেই নয়, এমন কি এর পরের অনেকগুলি সভাতেও। এর সঙ্গে তখনকার কোলকাতার সবচেয়ে বিতর্কিত নাম, অন্যতম শিক্ষিত ব্যক্তি এবং ধনীদের মধ্যে প্রথম সারির লোক রাজা রামমোহন রায়ও রয়েছেন অনুপস্থিত—একেবারে চুপচাপ।

তবে সভায়-সমিতিতে বা সামনে আগুয়ান অবস্থায় না দেখলেও হেয়ার এবং রামমোহন দু-জনেই কিন্তু সমস্ত অবস্থার ওপর লক্ষ্য রেখে চলেছেন। হেয়ার নৈমিত্তিক সংবাদ জোগাড় করছেন। তাঁর মানস-সন্তানের জন্মের প্রতিটি পর্যায়ের খবর তিনি সাগ্রহে

সংগ্রহ করছেন। প্রসূতি গৃহের দ্বারে অধীর উৎকণ্ঠায় পায়চারিরত পিতার মত হেয়ার উৎকর্ণ,—চিন্তারিদ্ধ।

এর থেকে যদি প্রশ্ন হয় যে হেয়ার এবং রামমোহন ইংরেজী বিদ্যালয় স্থাপন করা সম্বন্ধে এত আগ্রহী হয়েও সামনে এলেন না কেন? এর উত্তর বড় মজার—তখনকার কোলকাতাবাসীর বিচিত্র চরিত্রের স্বরূপ এই উত্তরের মধ্যেই রয়েছে। প্রথমে রামমোহনের কথাই বলি।

রামমোহন কোলকাতায় এসেই,—তাই বা কেন, তার আগে থেকেই হিন্দু ধর্মের গোঁড়ামী, তার কুসংস্কারকে আক্রমণ করতে শুরু করেন। পুতুল পূজো, সতীর নাম করে জ্যান্ত মেয়েদের পুড়িয়ে মারা, এই সব কিছুর বিরুদ্ধেই তিনি প্রচণ্ড ভাবে লেগে গেলেন। হিন্দুরা তাঁর ওপর ক্ষেপে গেল। সকলেই তাঁকে 'নাস্তিক', 'পাষণ্ড' বলে দিন-রাত গাল পাড়তো। তাঁর কাজ-কর্ম থেকে গোঁড়া হিন্দুরা যতখানি সম্ভব দূরত্ব বজায় রেখে চলবার চেষ্টা করতো। তাই রামমোহনের বন্ধু ডেভিড হেয়ার যখন পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা, বিশেষ করে ইংরেজী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার কথা অনেকের মতো রামমোহনের কাছে জানিয়েছিলেন, তখন তিনি তাতে রাজী না হয়ে পেরেছিলেন এমন মনে করার পেছনে কোনো যুক্তি নেই।

এ সম্বন্ধে যে গল্প আছে তা হচ্ছে এই যে : ভাল কাজে অনেক ব্যাগড়া। ঐ সময়ে রামমোহন রায়ের সম্বন্ধে কোলকাতায় বড় গোলোযোগ হতো। যাতে সতীদাহ না হয়, পৌত্তলিকতা উঠে যায়, সকলেই এক নিরাকার ঈশ্বরের ভজনা করেন,—রামমোহন তার জন্যে প্রাণপণে চেষ্টা করতে লাগলেন। হিন্দু শাস্ত্র থেকে এই সব কাজের জন্যে উদাহরণ ও সংস্কৃত শ্লোক জোগাড় করতে লাগলেন। ব্রাহ্মণদের গায়ত্রী মন্ত্র,—যা এতদিন গোপন ছিল তাও ছাপিয়ে শূদ্র-কায়স্থ

নির্বিশেষে সকলের কাছে পৌঁছে দিতে লাগলেন। ঘোর কলি ঘনিয়ে উঠলো—দেশ এবার ধ্বংস হবেই মনে করে গোঁড়া, সকার উপাসকেরা একেবারে ক্ষেপে গেলেন। রামমোহন রায়ের নাম শুনলে বলতেন যে —'ও পাষণ্ডের নাম করো না'—'ওটা নাস্তিক'—'ওর কাজে দেশ-ধর্ম সব রসাতলে যেতে বসেছে।' শোনা গেল, এমন যে রামমোহন রায় সে নাকি দেশীয় যুবকদের শিক্ষার জন্যে যে প্রতিষ্ঠান তৈরী হতে চলেছে তার অধ্যক্ষ হবেন। এই কথা শোনা মাত্রই সকলেই রে রে করে উঠলেন। যাঁরা টাকা দিয়ে, গায়ে-গতরে ঐ স্কুলের জন্যে সাহায্য করতে চেয়েছিলেন তাঁরা বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়কে ডেকে সাফ বলে দিলেন : বাপুহে, তোমাদের ঐ ইংরিজি স্কুলের সঙ্গে আমরা আর নেই। ভয়ঙ্কর সব কাণ্ডের সঙ্গে জড়িয়ে শেষে নিজেদের জাত-ধর্ম খোয়াবো।

বৈদ্যনাথবাবু আকাশ থেকে পড়লেন। তীরে এসে শেষে তরী ডুববে নাকি? তিনি সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করলেন : ব্যাপার কি? কথা দিয়ে, সব কিছু ঠিকঠাক করে আপনারা এমনভাবে পেছিয়ে যাচ্ছেন কেন?

তাঁরা বললেন : পেছিয়ে যাবো না! কি সব কথা শোনা যাচ্ছে!

বৈদ্যনাথ : কি সব কথা?

—আমরা শুনতে পেলাম যে ব্যাটা নাস্তিক রামমোহন নাকি তোমাদের ঐ বিদ্যালয়ের একজন অধ্যক্ষ হবেন? রামমোহন যে কাজে আছে, তার মধ্যে আমরা আর নেই। বিধর্মীর সঙ্গে কথা বলাতেও পাপ।

বৈদ্যনাথ তো সব শুনে একেবারে হতভম্ব। একথা ঠিকই, যে রামমোহন এই বিদ্যালয়ের সঙ্গে পরোক্ষভাবে যুক্ত আছেন। অধ্যক্ষ না হোন, টাকা দিয়ে এবং অন্য ভাবেও রামমোহনকে এর মধ্যে নেওয়া হয়েছে।

শুভকাজের শুরুতেই এই রকম একটা বাধা আসায় বৈদ্যনাথবাবু বিশেষভাবে দম খেয়ে গেলেন।

বিচারপতি ঈস্টের কাছে গিয়ে সব কথা জানানো হলো। তিনিও চিন্তিত হয়ে পড়লেন। এই খবর শেষে হেয়ারের কাছে গিয়েও পৌঁছালো। হেয়ারও ভাবনায় পড়লেন। তাইতো কি করা যায়। একদিকে রামমোহনের মতো বুদ্ধিমান—অর্থবান ও শিক্ষিত বন্ধু এবং হিতৈষী,—আর অন্যদিকে গোঁড়াদের গোঁ। কি করা যায়! মহাসমস্যায় পড়লেন হেয়ার। তাঁর এত সাধের পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা-প্রচারের পরিকল্পনা—এদেশের আগামী বংশধরদের নিয়ে গড়ে তোলা এতদিনের একটা স্বপ্ন, বুঝি এইভাবে চুরমার হয়ে যায়।

ভীষণ চিন্তার ছাপ পড়লো হেয়ারের চোখে-মুখে। কি করা যায় ভাবতে ভাবতে তিনি গিয়ে পৌঁছোলেন রামমোহন রায়ের বাড়ীতে। রামমোহন বন্ধুকে দেখে তাঁর স্বভাবসিদ্ধ উচ্ছ্বাসের ভঙ্গীতে আপ্যায়ন করে নিলেন। অন্যদিনের মতো আজ কিন্তু হেয়ার তেমন সহাস্য হয়ে উঠতে পারলেন না। কেমন যেন মনমরা—ঠাণ্ডা হয়ে রইলেন।

হেয়ারকে নিশ্চুপ দেখে রামমোহনের আবেগেও ঠাণ্ডা জল পড়লো। সন্দিগ্ধ চিত্তে ভ্রূ কুঁচকে জিজ্ঞাসা করলেন: কি খবর ডেভিড। কোন বিপদ হয়েছে নাকি? দেশ থেকে কি কোন খারাপ খবর এসেছে?

হেয়ার বললেন: না রাজা! আমার ব্যক্তিগত কোনো খারাপ খবর নেই।

তবে?

এ যে বড় এক লজ্জার,—ভীষণ অপমানের কথা। তোমাকে বলি কেমন করে।

আরে ডেভিড খুলে বলো? অমন ভাবে পেটে কথা রেখে

আর মুখে হা-হুতাশ করে আমাকে দগ্ধে মেরো না। তোমার যীশুর দোহাই—। যা হয়েছে তা খুলে বলো।

হবে আর কি? তুমি কি শোন নি গোঁড়ারা কি কাণ্ড করতে চলেছে!

কই না তো? গোঁড়ারা আমাকে গালাগালি দেওয়া ছাড়া আর নতুন কি করতে পারে।

রাজা, সে বড় বিচ্ছিরি ব্যাপার। তুমি তো জানো যে, বিচারপতি হাইড ঈস্ট আমাকে আর বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়কে নিয়ে—তোমাদের দেশের হিন্দুদের সামনে রেখে, হিন্দু ছেলেদের ইংরেজী শেখাবার জন্যে স্কুল খোলবার ব্যবস্থা করছেন।

হাঁ জানি। এ নিয়ে গত ১৪ই মে ঈস্টের বাড়ীতে মিটিংও হয়ে গিয়েছে। এ কাজে সকলের খুব উৎসাহের খবর পেয়ে বেশ ভালো লাগলো। যাক্ এতদিন বাদে গোঁড়াদের ধর্মে মতি হয়েছে। আমি যে টাকা দেবো বলেছি সেটা কবে নেবে!

সেইখানেই তো মুশকিল হয়েছে!

কেন এর মধ্যে আবার মুশকিলের কি আছে?

তোমার কাছ থেকে টাকা নেবো শুনে গোঁড়ারা ভারী জোর গোল তুলেছে। তোমাকে যা তা বলে গালাগাল দিতে আরম্ভ করেছে। বলছে যে তুমি এর মধ্যে থাকলে তারা আর থাকবে না। তোমার টাকা তারা গো-রক্ত বলে মনে করে।

সব শুনে,—হেয়ারের উদ্বেগ দেখে—রামমোহন হো হো করে হেসে উঠলেন। শেষে হাসির বেগটা খানিক থামিয়ে বললেন যে এই জন্যে তোমার এত চিন্তা। ডেভিড তুমি কোন ভাবনা করো না। যদি সত্যি সত্যি একটা মহৎ কাজ হয়, এ দেশের জীবনে ও চিন্তায় যে জমাট কালো অন্ধকার আছে তা যদি সত্যিই দূর হয়—তবে আমি গোঁড়াদের থেকে সরে থাকতে রাজী আছি।

সত্যি রাজা তুমি মন থেকে এই কথা বলছো। তোমার কোন রাগ বা দুঃখ হচ্ছে না।

তুমি তো জানো ডেভিড, যে এদেশের ভালো করবার জন্যে, কুসংস্কারগুলোকে ঝেঁটিয়ে বিদেয় করবার জন্যে আমার সর্বস্ব পণ করেছি। আর আমি সরে থাকলে যদি সত্যিই এদেশে ইংরেজী শেখবার স্কুল তৈরী হয়, তবে তাতে আদৌ দুঃখিত হবো কেনো। তাছাড়া তুমি তো আছ, বৈদ্যনাথবাবু আছেন। তোমরাই হবে আমার মুখপাত্র। তোমাদের পেছনে সব সময়, সব রকম ভাবেই আমি রইলাম।

রামমোহনের কথা শুনে ডেভিড হেয়ার হাঁ করে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে রইলেন। রামমোহনের মহত্বে তাঁর মাথা নুঁয়ে এলো। বললেনঃ এই ভয়ঙ্কর দুঃখজনক কথাটা তোমাকে বলতে আমার বুক ফেটে যাচ্ছিল। কি জানি পাছে তুমি দুঃখ পাও,—অসন্তুষ্ট হও। এখন তুমি স্বেচ্ছায় সরে এসে দেশের যে উপকার করলে তা কেবল তোমার পক্ষেই করা সম্ভব। যাই, আমি এখনই এই সংবাদ ঈস্টকে জানাই। তিনি যেন বৈদ্যনাথ বাবুকে ডেকে গোঁড়াদের জানিয়ে দেন যে, প্রস্তাবিত বিদ্যালয়ে রামমোহনের কোন ছোঁয়াচ লাগছে না।

'এতদ্দেশীয় বালকগণের শিক্ষার্থে একটি বিদ্যালয়' স্থাপনের গোড়াপত্তনের কাজে রামমোহনকে কেন্দ্র করে গোঁড়াদের যে বাধা তা দূর হলো।

রামমোহনের এই উদারতা সম্পর্কে কেউ কেউ সন্দেহ করে থাকেন। তাঁদের কারুর কারুর মত এই যে রামমোহন এদেশে প্রথম ইংরেজী শিক্ষার বিদ্যালয় বা 'হিন্দু কলেজে'র প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে কোন ভাবেই যুক্ত ছিলেন না। কিন্তু এই সিদ্ধান্তের মধ্যে গায়ের জোর ছাড়া কোন যুক্তি নেই। কারণ, আমরা ডেভিড হেয়ারের এই

সরল-জীবন-কাহিনীর মধ্যে উল্লেখ করেছি যে রামমোহনের 'আত্মীয়-সভা'র এক অধিবেশনে হেয়ার 'বেদান্ত বিদ্যালয়' স্থাপনের পরিবর্তে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার স্কুল তৈরীর প্রস্তাব দিলে রামমোহন সে বিষয়ে পূর্ণ সমর্থন জানিয়েছিলেন। এই সত্যটি প্রাচীন কোন লেখক বা সংবাদদাতাই অস্বীকার করেন নি। দ্বিতীয়ত, তখনকার কোলকাতায় কোন একটি প্রগতিশীল কাজ হচ্ছে, আর রামমোহন তার থেকে বাদ আছেন—বা তার সম্বন্ধে উৎসাহ প্রকাশ করছেন না, এমন হতেই পারে না। তৃতীয়ত, তাঁর সম্বন্ধে দেশীয় গোঁড়ারা কি মনোভাব পোষণ করে থাকে তা রামমোহনের চেয়ে বেশী আর কে জানে? তাই ইংরেজী শিক্ষা ও বিদ্যালয় সম্পর্কে উৎসাহ দেখিয়েও তাঁকে ওর-ই স্বার্থে দূরে থাকতে হয়েছে। চতুর্থত, ১৮২২ খ্রীস্টাব্দে নিজ ব্যয়ে ইংরেজী শিক্ষার বিদ্যালয় স্থাপন, ১৮২৩ খ্রীস্টাব্দে লর্ড আমহার্স্টকে লেখা পত্র, ১৮৩০ খ্রীস্টাব্দে ডফ্ সাহেবকে ইংরেজী বিদ্যালয় স্থাপনে সাহায্য দান যে মানুষ অকুণ্ঠভাবে করেছেন এবং যিনি হেয়ার সাহেবের অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন,—তাঁর পক্ষে ১৮১৬-১৭-র 'হিন্দু কলেজ' স্থাপনের মতো বিরাট কর্মযজ্ঞ সম্পর্কে একেবারে নিস্পৃহ থাকার ধারণাটি কোন মতেই যুক্তিতে টেঁকে না।

এর পরে আসে হেয়ারের কথা।

হেয়ারের সমসাময়িক, গুণগ্রাহী বা সাহায্যপ্রাপ্ত ছাত্র সকলেই বলেছেন যে 'হিন্দু কলেজে'র আদি প্রকল্পক ছিলেন হেয়ার। যাঁরা এই মতের বিরুদ্ধতা করেন তাঁদের প্রধান যুক্তি হলো: ক. ১৮১৬ খ্রীস্টাব্দের ১৪ই মে ঈস্টের বাড়ীর প্রথম সভায় হেয়ারের অনুপস্থিতি। খ. এর চার দিন পরে ঈস্ট তাঁর বন্ধু জে. হ্যারিংটনকে যে চিঠি দেন তাতেও হেয়ারের নামোল্লেখ না থাকা। গ. হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার জন্যে যে সাব-কমিটি তৈরী হয় তার থেকেও তাঁর নামের বিযুক্তি। ঘ. এমন কি হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার দু-তিন বছরের মধ্যেও সেই

প্রতিষ্ঠান প্রসঙ্গে তাঁর নাম যুক্ত না হওয়া ;—অথচ ১৮১৮ খ্রীস্টাব্দের ১লা সেপ্টেম্বর 'কলিকাতা স্কুল সোসাইটি' প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার য়ুরোপীয় সম্পাদকরূপে হেয়ার যোগদান করেন।

গবেষকরা এই সমস্ত প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দিয়ে হেয়ার যে 'হিন্দু কলেজে'র আদি প্রকল্পকদের অন্যতম ছিলেন তা প্রমাণ করেছেন। হেয়ারের এই জীবনী-রচনায় সেই গবেষণার অবকাশ নেই। তবুও সংক্ষেপে এর উত্তরে বলা যায় যেঃ রামমোহনের 'আত্মীয় সভা'-তেই বেদান্ত বিদ্যালয়ের পরিবর্তে যে 'হিন্দু সন্তানদের এশিয় ও ইওরোপের ভাষা এবং বিজ্ঞানসমূহে শিক্ষিত' করে তোলাই বেশী প্রয়োজন একথা বারে বারে উঠেছে, তার সাক্ষী রামমোহন বা হেয়ারের সমসাময়িক প্রায় সকলেই। অতএব হেয়ারের মাথাতেই বিষয়টি অনেকদিন থেকেই ঘুরছিল। শুধু পরিকল্পনাটুকু কাজে লাগিয়ে নেওয়ার মত লোক পাওয়া যাচ্ছিল না।

এরকম হওয়ার কারণও আছে। তা-হচ্ছে এই যে হেয়ার এদেশে এসে এদেশীয়দের, বিশেষ করে হিন্দুদের জীবন ও সংস্কৃতি, আচার এবং ব্যবহারের সঙ্গে এমন ভাবে মিশে যেতে আরম্ভ করেন এবং পরে মিশে যান—যাতে তাঁর দেশীয় খ্রীস্টান এবং স্বদেশীয় ইংরেজদের মাথা কাটা যেতে থাকে। তাঁকে 'হিন্দু হেয়ার' বলে গঞ্জনাও সহ্য করতে হতো। ওদিকে তিনি যে পয়সা-রোজগার করেছিলেন তা দিয়ে স্বচ্ছন্দে একটা ইংরেজী শেখার স্কুল খুলে দিয়ে নিজের সাধ মেটাতে পারতেন। কিন্তু তাতে তিনি নিজের দেশওয়ালীদের সাহায্য পেতেন না। অন্যদিকে দেশীয় হিন্দুরাও অন্তরের সঙ্গে সাহেবের এই স্কুলকে গ্রহণ করতো না—সব সময়েই সন্দেহের চোখে দেখতো। এতে তাঁর মূল উদ্দেশ্যের সার্বিক সাফল্য কোন মতেই পাওয়া যেতো না। তাই যখন হাইড ঈস্টের মতো সরকারের পদস্থ কর্মচারী, কোলকাতাস্থ ইংরেজদের আস্থা-ভাজন এবং সমাজের মধ্যে অন্যতম

শ্রেষ্ঠ গণ্যমান্য ব্যক্তি একদিকে এবং অন্যধারে বৈদ্যনাথের মতো সৎ হিন্দু এই বিষয়ে উদ্যোগী হতে রাজী হলেন,—তখন হেয়ার সহজেই বুঝতে পারলেন যে তাঁর স্বপ্ন সফল হবে, তাঁর সাধ পূর্ণ হতে আর কোনো ঝাধা নেই। আর তখনই হেয়ারের মতো যথার্থ এবং নীরব কর্মী একদম পেছনে থেকে কাজ চালিয়ে যেতে থাকলেন।

দ্বিতীয়ত, হাইড ঈস্ট তাঁর বন্ধুকে যে চিঠি লিখেছিলেন তা-থেকে দেখা যাচ্ছে যে তিনি নিজে এই ধরণের বিদ্যালয়ের পরিকল্পনা আদৌ মাথায় আনেন নি। এবং তাঁর কাছে যে ব্রাহ্মণটি [বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়] প্রস্তাব নিয়ে গিয়েছিলো সেটিও তাঁর প্রস্তাব নয়। তবে এই প্রস্তাব কার ? এ প্রস্তাব ডেভিড হেয়ার ছাড়া আর কারও নয়। কারণ ঃ

ক. বৈদ্যনাথ ঈস্টকে যে কোনো কারণেই হোক হেয়ারের অবদান সম্পর্কে অবহিত করান নি, তাই ঈস্টের চিঠিতে হেয়ার অনুল্লিখিত। খ. আড়াই বছর ঈস্ট কোলকাতায় এসে হেয়ার সম্পর্কে যে সমস্ত কথাবার্তা স্বদেশীয়দের কাছ থেকে শুনেছেন তাতে তিনিও পরোক্ষভাবে হেয়ারকে অপছন্দ করতে আরম্ভ করেছেন। গ. হিন্দুদের কোনো রকমে অসন্তুষ্ট না করার সরকারী-নীতি-পোষক ঈস্ট চেয়েছিলেন যে, এই ব্যাপারের সমস্তটুকুই আসুক হিন্দুদের নিজেদের ইচ্ছার কাছ থেকে। ঘ. এদেশের হিন্দু-সন্তানদের য়ুরোপীয় পদ্ধতিতে শিক্ষিত করে তোলার চিন্তার সূচনার দিন থেকে ১৮৪২ খ্রীস্টাব্দের ১লা জুন মৃত্যু পর্যন্ত হেয়ারের সমগ্র কর্মপদ্ধতি অনুসরণ করলে আমরা একথা নিশ্চয়ই বলতে পারি যে,—তখনকার দিনে কোলকাতায় এমন একজনও ব্যক্তি ছিল না—কি এদেশীয় অথবা ওদেশীয় যে,—নিজের সমস্ত অর্থ-সামর্থ্য, সকল চিন্তা ও চেতনা, সর্ব স্বপ্ন ও সহানুভূতি এভাবে হিন্দু-সন্তানদের ভবিষ্যৎ মঙ্গলের জন্যে ব্যয় করেছেন। পারিপার্শ্বিক কারণে, বাস্তব অসুবিধার জন্যে ডেভিড হিন্দু কলেজের আদি-প্রকল্পকের

পরিচয়টিকে লুকিয়ে রেখেছিলেন ;—কিন্তু যে ভাবে তিনি নিজেকে এই মহান কর্তব্যের সঙ্গে জড়িয়ে ফেলেছিলেন সে ভাবে তো আর কেউ রাখেন নি। অবস্থা বৈগুণ্যে কুন্তী তাঁর কানীন পুত্রকে প্রকাশ্যভাবে স্বীকার করেন নি বলেই তাঁর সমস্ত বাৎসল্য-স্নেহ-হৃদয়-পীযূষধারা ঐ ভাসিয়ে দেওয়া ছেলেটির জন্যে স্বতই উৎসারিত হতো, —ঠিক তেমনি হেয়ারও নিজেকে এদেশের শিক্ষা-সূচনার জন্যে বিলিয়ে দিয়েছিলেন।

ঈস্ট প্রাথমিক উদ্যোগের পর কোথায় হারিয়ে গেলেন, রামমোহন অন্যতর বৃহৎ কাজে নিজেকে জড়িয়ে দিলেন, বৈদ্যনাথও তথৈবচ—কিন্তু হেয়ার প্রভাতী তারার মতো সূর্যকে দিনের দিগন্তে পৌঁছে দিয়ে মৃত্যুর অন্ধকারে বিশ্রাম নিয়েছিলেন। এতখানি ঐকান্তিক একাগ্র তন্ময়তা, এত বড় ত্যাগ যার তিনি কি তার জনক না হয়ে পারেন। এখানে যুক্তি এবং বিশ্বাস উভয়কেই সন্নত হতে হয়।

৪.

ঈস্টের বাড়ীতে ১৪ তারিখে মিটিং-এর পর রামমোহনকে নিয়ে যে গণ্ডগোলের সূত্রপাত হয় তা হেয়ারের মধ্যস্থতায় মিটে যাওয়ার পর ২১শে মে তারিখে আর একটি সভা হলো। তাতে ঠিক হয় যে এদেশের হিন্দু ছেলেদের ইংরেজী ও ভারতীয় ভাষা এবং ইওরোপ-এশিয়ার সাহিত্য ও বিজ্ঞান সম্পর্কে যথাযথভাবে শিক্ষা দেওয়ার জন্যে একটি কলেজ স্থাপন করা হবে! আরও ঠিক হলো যে গভর্নর এবং কাউন্সিলের সদস্যদের এই কলেজের পৃষ্ঠপোষক হওয়ার জন্যে অনুরোধ করা হবে। এবং বিচারপতি হাইড ঈস্টকে সভাপতি ও জে. এইচ. হ্যারিংটনকে সহ-সভাপতির পদ গ্রহণের অনুরোধ করা হবে।

হিন্দুদের দেশে, হিন্দুদের ছেলের জন্যে কলেজ,—তাই দেশীয়গণের প্রতিনিধিত্ব যাতে সর্বাধিক থাকে সেই দিকে লক্ষ্য রেখে কুড়ি জন দেশীয় সদস্য এবং আটজন য়ুরোপীয় সদস্য নিয়ে একটি কমিটি গঠন করা হলো। দেশীয়দের পক্ষ থেকে বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায় এবং ইংরেজদের পক্ষ থেকে লেফ্‌টেনেণ্ট আর্ভিন [Leiutenant Irvine]—এই দুইজন সম্পাদক নিযুক্ত হলেন। কলেজের নাম হলো 'কলিকাতা হিন্দু কলেজ'।

এই কমিটি কলেজ প্রতিষ্ঠা সংক্রান্ত নানা বিষয়ে আলোচনা করার জন্যে এর পরে অনেকগুলি সভ্য ডেকে আনুষঙ্গিক সমস্ত বিষয়গুলির খুঁটিনাটি আলোচনা করে। অনেক তর্ক-বিতর্ক মত বিনিময় হলো। কলেজের ছাত্র ও শিক্ষকদের বেতন, কলেজের তহবিল, আরও নানাবিধ সুযোগ-সুবিধার এবং অসুবিধার বিষয় ঠিক করে নিয়ে একটা খসড়া আইন তৈরী হলো। ডেভিড এই সমস্ত

সভা বা আলোচনায় প্রত্যক্ষভাবে উপস্থিত না থাকলেও বা অংশগ্রহণ না করলেও তাঁর অলক্ষ্য প্রভাব সর্বত্র উপস্থিত থাকলো। তিনি সম্ভ্রান্ত হিন্দুদের বাড়ী বাড়ী গিয়ে কলেজের তহবিল সংগ্রহ করলেন।

এরপর ১৮১৬ খ্রীস্টাব্দের ২৭শে আগষ্ট একটি সাধারণ সভা ডেকে কলেজ সংক্রান্ত সাধারণ আইনের খসড়াটিকে চূড়ান্তরূপে গ্রহণ করা হলো। কবে, কোথায় আপাতত কলেজ বসবে তাও ঠিক হয়ে গেল। এবং শেষে শুভদিন দেখে সকলের শুভেচ্ছা নিয়ে ১৮১৭ খ্রীস্টাব্দের ২০শে জানুয়ারী গরাণহাটায় গোরাচাঁদ বসাকের বাড়ীতে হিন্দু কলেজের উদ্বোধন হলো। বাঙালী তথা ভারতীয় ইতিহাসে সে এক মহাশুভক্ষণ।

যেদিন কলেজ স্থাপিত হলো সেদিন এই নবজাতকে উপলক্ষ করে কোলকাতার পুরাঙ্গণে শঙ্খধ্বনি হয়েছিল কি না, সে খবর আমাদের জানা নেই। তবে নব-বঙ্গের, নব-যুগের আগামী পরিচালকদের যে প্রসূতিগৃহ সেখানে উপস্থিত ছিলেন হাইড ঈস্ট, কোলকাতার বিশিষ্ট নাগরিক জে. এইচ. হ্যারিংটন, ডেভিড হেয়ার প্রমুখ। রাধাকান্ত দেব, বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়, রসময় দত্ত প্রভৃতি হিন্দুরাও অসীম আগ্রহে এই উদ্বোধন অনুষ্ঠানে হাজির হয়েছিলেন।

ক্রমে ক্রমে এই বার্তা সারা কোলকাতায় রটে গেল। গোড়া থেকেই হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার পেছনে একটি সংগঠিত উদ্যোগ এবং হেয়ার প্রভৃতির আন্তরিক আগ্রহ ও গঠন-শক্তি এমনভাবে সক্রিয় ছিল যে এই কলেজ প্রতিষ্ঠা একটা ঘটনা বা খবরের মর্যাদা পেয়েছিল। তাই পরের দিন—অর্থাৎ ২১শে জানুয়ারী, বহু লোক এই কলেজ বা তার পড়ুয়াদের দেখতে আসেন। সকলেরই চোখে-মুখে কৌতূহল, আগ্রহ, কি হয় কি হয় ভাব—কি হলো বা হবের চিন্তা। এদের মধ্যে হেয়ারেরই আনন্দ যেন সবচেয়ে বেশী। তাঁর চোখ-মুখ থেকে চাপা উচ্ছ্বাস, উচ্ছলিত আনন্দ উপচিয়ে পড়ছে।

উপস্থিত সমবেত সুধীজনকে সম্বোধন করে কলেজের দেশীয় সম্পাদক বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায় বললেনঃ 'আপনারা এখন এই বিদ্যালয়টিকে নিতান্ত শিশুরূপে দেখতে পাচ্ছেন। কিন্তু আজকের এই শিশুবৃক্ষ অনেকদিন পরে—যখন আপনারা, আমরা কেউ থাকবো না তখন ভারতের একটি সর্ববৃহৎ বৃক্ষে পরিণত হবে। একটি বিরাট বটবৃক্ষের আকার ধারণ করে এই শিশুবিদ্যালয় অনেকের পরম নিশ্চিন্ত আশ্রয়, পথিকের ক্লান্তি দূরকারী ছায়া দান করতে পারবে—সকলের মিলিত প্রচেষ্টা একদিন নিশ্চয়ই ফলপ্রসূ হবে।

শুভাকাঙ্ক্ষী জনের আশীর্বাদ, বন্ধুজনের করতালির মধ্যে দিয়ে হিন্দুকলেজ সুরু হলো। আধুনিক ভারতবর্ষের ভিতপূজো হয়ে গেল।

৫.

সুরু হলো ডেভিডের জীবনের নতুন অধ্যায়। যে ইচ্ছা এতদিন ছিলো স্বপ্নের সামগ্রী—যে আশা ছিলো আকাশ-কুসুম মাত্র—তা-আজ একটা পরিপূর্ণ চেহারা নিতে আরম্ভ করেছে। ডেভিড নিজের জীবনের সবকিছুকেই বাজি ধরলেন—এদেশের জাতক বা আগামী-জাতকদের নব-জীবনে প্রতিষ্ঠিত করার মহৎ কাজে। অন্ধকারের মায়ারাজ্যে আলোর রোশনাই জ্বালতে তিনি যেন অগ্নিসাধনার সূচনা করলেন।

এই কাজে ব্রতী হওয়ার ফলে ঘড়ির কাজে হেয়ারের আকর্ষণ আস্তে আস্তে শিথিল হয়ে আসতে থাকলো! আহার-নিদ্রাও ভুলতে থাকলেন। আর আহারই বা কি? এখানেও তিনি যেন পূর্ণ ব্রহ্মচারী—মিতাহারী। মদ মাংসে রুচি ছিল না। এদেশের মিঠাই, যেমনঃ সন্দেশ, চন্দ্রপুলি, ডাবের জল, মাগুর মাছের ঝোল ছিলো হেয়ারের প্রিয় খাদ্য। তাঁর এত কম বা এই ধরণের খাওয়ার কথা কেউ বললেই তিনি বলতেনঃ দেখো তোমরা আমার খাওয়া সম্বন্ধে বলো। কিন্তু তোমাদের দেশের মুনি-ঋষিদের দেখ। কেমন সুন্দর তাঁদের জীবন-যাত্রা। খাওয়া-দাওয়া, ভোগ-বিলাস সম্পর্কে কেমন নিস্পৃহ। এই বিষয়টি আমার খুব ভাল লাগে।

তাঁর রোজকার কাজের রুটিন ছিলো খুব সুন্দর। খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠতেন তিনি। তারপর প্রাতঃকৃত্যাদি সেরে যে মহৎ কাজের প্রয়োজনে নিজের জীবন উৎসর্গ করেছিলেন তার উন্নতির জন্যে—তার কোথায় কি করতে হবে, সেদিকে নজর ফেরাতেন। এরই মধ্যে সেরে নিতেন তাঁর সকালের টিফিন। একে সকালের টিফিন না বলে সারা-

দিনের খাবারও বলা যেতে পারে। তিন-চারখানা টোষ্ট, দুটো ডিম সেদ্ধ ও এক কাপ চা। তিনি কখনও মাখন খেতেন না। ঠাট্টা করে বলতেন ঃ কোলকাতার এই মাখন কেবল গরুর গাড়ীর চাকাতেই লাগানো চলে।

একথা খানিকটা ঠিকও বটে। তখনকার কোলকাতায় যাঁরা মাখন তৈরী করা দেখেছেন তাঁরাই একথা বলবেন। কেন না সে মাখন ছিল যেমন বাজে, তেমনিই তার নির্মাণ-পদ্ধতিও ছিল অত্যন্ত নোংরা। যেমন ঃ মাখনওয়ালার বাড়ির দরজার কাছেই ছিল লোকের যাতায়াতের রাস্তা। আর সেই রাস্তায় অনবরত উড়তো দম আটকানো ধূলো। এবং তারই মধ্যে আদিম গ্রাম্য প্রথায় তৈরী হতো মাখন। সেই অবস্থায় যদি কেউ একবার মাখন তৈরীর প্রক্রিয়াটা চোখে দেখতো, তবে তার সারাজীবনের মতো মাখন খাওয়ার প্রবৃত্তি উড়ে যেতো। কোলকাতার মাখন সম্পর্কে বোধ হয় হেয়ারের এটাই ছিল অভক্তির কারণ।

যাই হোক, এইভাবে মিতাহারের চরম দৃষ্টান্ত স্থাপন করে হেয়ার বার হতেন তাঁর নিজস্ব পাল্কী চেপে। যেতেন নিজের স্কুল আরপুলি বা পটলডাঙ্গায়। আরও যেতেন কোলকাতার দেশী-বিদেশী ধনীদের বাড়ীতে চাঁদা চাইতে।

সত্যিই ভিক্ষুকের মত লোকের দোরে দোরে দেশের শিক্ষা-বিস্তারের জন্যে চাঁদা চেয়ে বেড়িয়েছেন হেয়ার। নিজেও দান করেছেন অনেক। এমন কি ঋণগ্রস্থ হয়ে পড়ে নিজের জন্যে তৈরী করা বাড়ীটাও বেচে দিয়েছিলেন। সে সব পরের ইতিহাস—পরে বলবো।

আমরা আগেই জেনেছি যে কেবল লেখা-পড়া বা শিক্ষাদান করার প্রতিষ্ঠানের অভাবই যে সেকালে ছিল তাই নয়, ভালো বইও ছিলো না—যা দেখে ছেলেরা পড়বে। অবশ্য ইংরেজী সরকারী কর্মচারীদের

জন্যে যে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ তৈরী হয়েছিল সেখান থেকে কিছু কিছু বাংলা বই বেরিয়েছিল বটে, কিন্তু তা সাধারণের কোন কাজে আসেনি। তাই বাইরের সাধারণ ছেলেরা তাদের শিক্ষার সবটুকুতেই বর্ণ ও রাশিমালা লিখতে জানতো, আর জানতো অসম্পূর্ণভাবে গণিত-এর কিছুটা। পাঠ-অভ্যাস করার বালাই তার মধ্যে ছিলো না। তার কারণও অবশ্যই ছিলো। ভুল বানান, টুকরো টুকরো এবং আংশিক লেখা শেখা—বিজ্ঞান বা পারস্পরিক কিংবা নৈতিক কর্তব্য-জ্ঞান বা ঐ বিষয়ে কোন চেতনা গড়ে তোলার চেষ্টা আদৌ তার মধ্যে ছিলেন না।

অন্য অনেকের মতো হেয়ারও এই অসম্পূর্ণতার কথা বুঝতে পেরেছিলেন। তিনি আরও বুঝেছিলেন যে মাতৃভাষার ওপর জোর দিতে হবে সবচেয়ে বেশী। এই সব প্রয়োজন ও অসুবিধার কারণেই খুব স্বাভাবিক ভাবেই আধুনিক শিক্ষা প্রসারের প্রথম মন্দিরটি গড়ে ওঠার মাত্র পাঁচ মাসের মধ্যেই ৪ঠা জুলাই ১৮১৭-তে 'ক্যালকাটা স্কুল বুক সোসাইটি' নাম দিয়ে একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে—মন্দির নির্মাণের সঙ্গে সঙ্গে তাতে বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার মতো। এখানেও হেয়ারের উদ্যম, প্রচেষ্টা, আগ্রহ এবং সক্রিয় উৎসাহ প্রধান হয়ে দাঁড়িয়েছিলো।

তিনি যা মনে মনে আকাঙ্ক্ষা করতেন এই নবজাত সোসাইটি তাকেই মর্যাদা দিয়ে তার কার্যক্রম নির্ধারণ করলো। এই সোসাইটির উদ্দেশ্য ছিলো, ইংরেজী এবং প্রাচ্য ভাষাগুলিতে শিক্ষা দেওয়া হয় এমন বিদ্যালয় বা শিক্ষানিকেতনের উপযোগী বই তৈরী করা, সেগুলিকে ছাপানো এবং সস্তাদরে বা বিনা-মূল্যে বিতরণ করা। এই সঙ্গে হেয়ার আরও একটি বিষয়ে নজর দিয়েছিলেন। সেটি হলো যে কোনক্রমেই এই সোসাইটি যেন কোনো ধরণের ধর্মপুস্তক ছাপাতে বা রচনায় উৎসাহ দিতে না পারে।

হেয়ার বলতেন আমি খ্রীস্টান, তাই বলে কি স্কুলগুলোকে গীর্জা

তৈরী করে ফেলতে হবে। লেখাপড়া শেখার সঙ্গে খ্রীস্টতত্ত্বের ঘোল মেশিয়ে সরবৎ বানাতে আমি রাজী নই। এর জন্যে গোঁড়া দেশীয় খ্রীস্টানদের কাছ থেকে হেয়ারকে অনেক গঞ্জনা সহ্য করতে হয়েছিলো। জীবতাবস্থাতে তো বটেই, এমনকি মৃত্যুর পরেও।

যাই হোক, 'স্কুল বুক সোসাইটি' তৈরীতে হেয়ার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে সাহায্য করলেন—কিন্তু সেই একই স্বভাব ; নাম নিয়ে—পদাধিকার নিয়ে তিনি কোন কাজ করতে ভালবাসেন না। তাই এখানেও নীরব কর্মী হেয়ার এই সোসাইটির কর্মকর্তাদের মধ্যে কেউ একজন হয়ে রইলেন না ;—চোখের ওপরের পাতা যেমন দৃষ্টির সবচেয়ে কাছে থেকেও চোখে পড়ে না।

নতুন পড়ুয়াদের নতুন যুগের উপযোগী বই যোগান দেওয়ার জন্যে 'স্কুল বুক সোসাইটি' ; নতুন যুগের নতুন মানুষ তৈরীর জন্যে 'হিন্দু কলেজ' ; চারা গাছকে বাঁচানোর জন্যে বেড়া দেওয়ার মতো ঐ কলেজের পাশে পাশে হেয়ারের চেষ্টা-উদ্যোগ বা অর্থ সামর্থ্যে তৈরী করা আরপুলি, সিমলা, পটলডাঙ্গার পাঠশালা প্রভৃতি স্কুলগুলি,—ইত্যাদি বিরাট কর্মযজ্ঞের সামনে দাঁড়িয়ে হেয়ার আর স্থির থাকতে পারলেন না। শরীর রোমাঞ্চিত হয়ে উঠতে লাগলো—স্বপ্নের আকাঙ্ক্ষাগুলি বাস্তব রূপ নিয়ে প্রত্যক্ষ হয়ে উঠলো। দক্ষিণের বাতাস আর মধুপের গুঞ্জনে যেমন অরণ্যে শিহরণ লাগে—ফুলেরা দল মেলে, ঠিক তেমনি নতুন কোলকাতার আকাশে-বাতাসে নবীন পড়ুয়াদের মিলিত কণ্ঠস্বর অভিনব মধুর গুঞ্জন তুলতে লাগলো।

হেয়ারের কাজ বেড়ে গেল—তিনি তন্ময় হয়ে সমস্ত মনোযোগ ঢেলে দিলেন দেশের শিক্ষা-বিস্তারের কাজে। একজন বিদেশী ঘড়িওয়ালাকে কোলকাতার লোক দেখতে পেল নবপ্রতিষ্ঠিত শিক্ষা-ব্যবস্থার প্রচারে ও প্রসারে সর্ব-সময়ের একমাত্র কর্মী হিসেবে। কোনো বেতন নেই, কোন আহ্বানের অপেক্ষা নেই, নাম বা

পদাধিকারের কোন মোহ নেই—পাল্‌কীতে লেখা-পড়ার নানান সরমযাম, যেমন বই-খাতা-তালপাতা-কলম বোঝাই করে চলেছেন এ পাঠশালার দোর থেকে ও পাঠশালায়। প্রয়োজনে পড়ুয়া ছেলেদের বাড়ী পর্যন্ত ধাওয়া করছেন—কে স্কুলে আসছে, কে আসছে না, কে পড়ছে, কে পড়ছে না—কেনই বা পড়ছে না—সব রকম তত্ত্ব-তল্লাস তাঁর নখদর্পণে।

হেয়ার এই সঙ্গে আরও একটা বিষয়ের ওপর খুব কড়া নজর রাখতেন, তা হচ্ছে পড়ুয়াদের নৈতিক চরিত্রের দিকে। আগেই বলা হয়েছে যে তখনকার দিনের কোলকাতার নৈতিক পরিবেশ বালকদের পক্ষে ছিলো অত্যন্ত মারাত্মক। হেয়ার বাবুদের বাড়ীর যাত্রার আসরে বা নাচের মজলিসে হাজির হয়ে কোন ছাত্রকে সেখানে দেখতে পেলেই তুলে দিতেন, ধমক লাগাতেন। কোন সময়ে জোর করে তাদের বাড়ীতেও পৌঁছে দিয়ে আসতেন। তিনি মনে করতেন যে কেবল পাঠশালায় বা স্কুলে যাতায়াত করলেই হবে না—সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত দিক থেকে নিজেকে পরিচ্ছন্ন করে না তুলতে পারলে পুঁথিগত বিদ্যা ব্যর্থ হয়ে যাবে। হেয়ার তাঁর স্বাভাবিক অনুভবশক্তি ও সহানুভূতি দিয়ে মূল সমস্যার গোড়ায় গিয়ে হাজির হতে পেরেছিলেন। সেদিন এই দৃষ্টি বা জ্ঞান আর কারোরই ছিল বলে মনে হয় না।

৬.

১৯১৭ খ্রীস্টাব্দের জানুয়ারী থেকে জুনের মধ্যেই—এদেশে নবীন কালোপযোগী শিক্ষা ব্যবস্থার গোড়া পত্তন করার কিছুদিনের মধ্যেই, এখানকার বালকদের মানসিক এবং নৈতিক উন্নতি যাতে হয় তার জন্যে সত্যিকারের আগ্রহী কয়েকজন য়ুরোপীয়—যার মধ্যে হেয়ারও একজন, বুঝতে পারলেন যে এদেশীয়দের লেখাপড়া শেখানোর উপযোগী এবং যথার্থভাবে সংগঠিত একটি শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের দরকার। যেটি,—দেশের মধ্যে গড়ে উঠেছে, উঠছে বা উঠবে এমন শিক্ষালয়গুলিকে নিয়ন্ত্রণ করবে, সামগ্রিক ভাবে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার মান নির্ণয় করবে এবং যে বিষয়ে পরামর্শ বা সাহায্য দেবে। এই উদ্দেশ্য সম্পর্কে আলোচনা করার জন্যে ১৮১৮ খ্রীস্টাব্দের ১লা সেপ্টেম্বর কোলকাতার টাউন হলে একটা জনসভার আয়োজন করা হলো। তাতে দেশের বহু সম্ভ্রান্ত এবং জ্ঞানী-গুণীরা যোগ দিলেন এবং নানাদিক থেকে নানাভাবে আলোচনা করলেন। এবং অবশেষে ঠিক হলো যে 'দি ক্যালকাটা স্কুল সোসাইটি' নামে একটি সমিতি তৈরী করা হবে। এই সভায় সভাপতিত্ব করেছিলেন সদর দেওয়ানী আদালতের বিচারপতি জে. এইচ. হ্যারিংটন।

এই সোসাইটিতে হেয়ারকে নিয়ে আসা হলো অধ্যক্ষ সভার সদস্য হিসেবে। আসলে হেয়ারকে তৎকালে প্রতিষ্ঠিত দেশীয় শিক্ষার সূচনা বা প্রসারের যে কোনো রকম প্রতিষ্ঠানের কর্ম-সমিতিতে কোনো পদ দেওয়া হোক বা না হোক—তিনি সর্বত্রই ছিলেন বা থাকতেন—সূর্যের আলো কেউ চা'ক বা না চা'ক অবারিত উদারতায় বিশ্বকে আলোকিত করতেই থাকে। এদেশের মানবকগুলির মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের কাজে হেয়ার সমস্ত রকম মান-অপমান, নিমন্ত্রণ বা বিনা নিমন্ত্রণ গ্রাহ্য না করে সব জায়গাতেই হাজির হতেন। মৃত্যুর

আগের দিন পর্যন্ত কেউ এবিষয়ে তাঁকে পরাঙ্মুখ দেখেনি।—কেন এমন হয়েছিল—তার কোনো যুক্তি-সঙ্গত ব্যাখ্যা দেওয়া বোধ হয় কারুর পক্ষেই সম্ভব নয়। একেই বোধ হয় বলে অহৈতুকী ভালোবাসা—এই ভালোবাসারই আর এক নাম পূজা—বিশ্বের অমৃতের পুত্রদের জন্যে প্রাণের শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য নিবেদন।

একদিকে 'হিন্দু কলেজ', আর দিকে 'দি ক্যালকাটা স্কুল সোসাইটি'—মাঝখানে 'ক্যালকাটা স্কুল বুক সোসাইটি' আর এদের চারপাশে গড়ে ওঠা বা উঠতে থাকা বেশ কিছু পাঠশালা এবং সব মিলিয়ে দেশী-বিদেশী শিক্ষক-পরিচালকগণ, দেশীয় অভিভাবককুল ও অনেকগুলি সুকুমারমতি চপল-চঞ্চল বালকদল। আর এই পরিধির চারদিকে অনবরত-অবিরত ঘুরে বেড়াচ্ছেন হেয়ার।

ফলে, হেয়ারের কাজ বেড়ে গেছে। কোথায় স্কুল ফণ্ডে টাকা নেই, তা উঠে যাবার দাখিল, হেয়ার চললেন ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে। নিজেও সাধ্যমত টাকা দান করলেন। কোনোও না কোনো ভাবে পরিচালনার ব্যয় ভার গ্রহণ করলেন। কোথায় শিক্ষক বা পরিচালকদের মধ্যে পারস্পরিক মত-বিরোধ মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে—তিনি এলেন তার মধ্যস্থতা করতে। আর সবচেয়ে বেশী নজর থাকতো—যাদের নিয়ে এই সমস্ত আয়োজন—সেই ছাত্রদের ওপর। তিনি এক পাঠশালা থেকে আর এক পাঠশালায় ঘুরে ঘুরে দেখছেন কে কে পড়তে আসেনি? সঙ্গে সঙ্গে কেন সে আসেনি তার খোঁজ নিতে সুরু করলেন। যদি অসুখের কারণে ছাত্রটি অনুপস্থিত হয়ে থাকে তবে চল তার বাড়ীতে, তার ওষুধ-পথ্যের ব্যবস্থা করো। প্রয়োজনীয় ওষুধ তো তাঁর পালকীতেই রয়েছে। কেউ পয়সার অভাবে পড়াশুনাই ছেড়ে দেবার মতলব করছে—হেয়ার ছুটলেন তার বাড়ীতে তাকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে, ফ্রি পড়ানোর আশ্বাস দিয়ে এমন কি তার মা-বোনদের

জন্যেও ভাত-কাপড়ের ব্যবস্থা করে তিনি পলাতক ছেলেকে আবার ফিরিয়ে আনলেন পাঠশালায়।

এইভাবে ক্রমেই জড়িয়ে পড়ছেন হেয়ার মায়ার বন্ধনে। কচি-কাঁচা অবোধ বালকদের পুলকিত—বিস্মিত—দুঃখিত মুখের রঙগুলি তাঁর হৃদয়াকাশে রামধনুর সৃষ্টি করতো। তিনি ক্রমশই তাঁর জীবিকার জন্যে যে কাজ, তার থেকে অন্যমনস্ক হয়ে পড়তে লাগলেন্—হেয়ারের ঘড়ির ব্যবসায়ে আস্তে আস্তে আলগা পড়তে লাগলো। শেষে একদিন, এইভাবে দু-নৌকোয় পা-দিয়ে চলা যায় না বিবেচনা করে হেয়ার 'গবর্ণমেণ্ট গেজেটে' বিজ্ঞাপন দিয়ে বসলেন:

'এতদ্বারা ঘড়ি নির্মাতা ডেভিড হেয়ার তাঁর বন্ধুগণ ও সর্বসাধারণকে জানাচ্ছেন যে, তিনি আজ থেকে তাঁর ব্যবসায় অবসর নিলেন। গত আঠারো বছর ধরে তাঁরা উদারভাবে সাহায্য করে তাঁকে যে অনুগৃহীত করেছেন সেজন্যে তিনি তাঁদের আন্তরিক ধন্যবাদ দিচ্ছেন।

'এই সুযোগে তিনি তাঁর স্থলাভিষিক্ত মি. গ্রে-র প্রতি আগের মতো অনুগ্রহ দেখাবার জন্যে তাঁদের সাগ্রহে ও সসম্মানে অনুরোধ করছেন। বিলেত থেকে এসে মি. গ্রে গত পাঁচ বছর ধরে তাঁর সহকারী হিসেবে ছিলেন। গ্রে-র চরিত্র ও গুণপনা সম্বন্ধে ডেভিড হেয়ার এতটা জানতে পেরেছেন যে তাঁদের গ্রে-র ওপর বিশ্বাস স্থাপন করতে তিনি [হেয়ার] এতটুকুও দ্বিধা বোধ করছেন না। ১লা জানুয়ারী ১৮২০।'

ঘড়ির ব্যবসা ছেড়ে দিলেন। নিজের বলতে রইলো শুধু—সাত-সমুদ্দুর তের নদীর পারের এই বিজাতীয় মানুষগুলির উপকার করার ইচ্ছে। এই ইচ্ছে হেয়ারের বাকী বাইশ বছরের জীবনটাকে আলোয় আলোময় করে রেখেছিলো—ঠিক যেমন রাতের অন্ধকার কাটিয়ে দিনের সূর্য আকাশটাকে উজ্জ্বল করে রাখে। তাই এই ঘটনা অভূতপূর্ব আলোকময় একটি জীবনের ইতিহাস।

৭.

হেয়ারের অদম্য উৎসাহ, আগ্রহ এবং ইচ্ছায় ১৮১৭ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল নব্য-ভারতের নির্মাণশালা হিন্দু কলেজ। ঐ সালেরই জুলাই মাসে তৈরী হলো 'স্কুল-বুক সোসাইটি' এবং পরের বছরের সেপ্টেম্বর মাসে দেশের শিক্ষার মান-নির্ণয়, প্রসার ও নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনে এরই স্বাভাবিক ক্রম হিসেবে স্থাপিত হয়েছিল 'দি ক্যালকাটা স্কুল সোসাইটি'। এ-দের কথা আগেই বলে আসা হয়েছে। দেখে এসেছি সর্বত্র হেয়ারের উজ্জ্বল উপস্থিতি—সক্রিয় ইচ্ছা এবং তন্ময় আবেগ ও দরাজ অর্থদানের নিষ্কুণ্ঠা। এইভাবে হেয়ার এক বছর চার মাসের মধ্যেই রোজগারের মূল উৎস, ঘড়ির ব্যবসাটাও বন্ধুকে দিয়ে ঝাড়া হাত পা হয়ে লেগে গেলেন দেশীয় শিক্ষা-তরুর শিশু বীজটিকে জল-সিঞ্চন করতে।

সকালে বাড়ী থেকে বেরিয়ে প্রথমে যেতেন আরপুলির পাঠশালায় —নিজের পাঠশালা এটা। কেবল এটাকেই কেন বলি—পটলডাঙ্গার স্কুল, কলুটোলা ব্রাঞ্চ স্কুল, সিমলা স্কুল সব জায়গাতেই হেয়ারের অকুণ্ঠ দান, অপরিমিত স্নেহ এবং তত্ত্বাবধান জড়ানো রয়েছে। তাই সব জায়গাতেই তিনি একের পর এক যেতেন, খোঁজখবর নিতেন—তত্ত্বতল্লাস করতেন। তাই সব স্কুলকেই তাঁর নিজের স্কুল বলতে দ্বিধা কোথায়? তাঁর মৃত্যুর পর ১৮৪২ খ্রীস্টাব্দের ১৩ই জুন তদানীন্তন শিক্ষাপরিষদের সম্পাদক বাবু রসময় দত্ত একটি রিপোর্টে যে কথা লিখেছেন তাতেই আমার কথার সত্যতা প্রমাণিত হবে।

তিনি লিখছেন: 'একথা মনে করার যথেষ্ট কারণ আছে যে এই বিদ্যালয়ে [স্কুল সোসাইটির পটলডাঙ্গাস্থিত ইংরেজী বিদ্যালয়ে]

যা ছাত্র ভর্তি করার তা সম্পূর্ণভাবে হেয়ারই এতদিন করতেন। এখানকার ছাত্রেরা বেতন, বইপত্র বা কাগজ-কলমের জন্যে কিছুই দিত না। বিদ্যালয়ের নিয়ম-শৃঙ্খলা যা কিছু তা-ও হেয়ার ব্যক্তিগত ভাবে একাই রক্ষা করতেন। সরকারের নির্ধারিত পাঁচশ টাকার বেশি যা খরচ হতো তাও দিতেন হেয়ার নিজের পকেট থেকে।'

এরকম আরো কতো-ই না! কি কথায় কি কথা এসে পড়লো। যাই হেয়ারের রোজের কাজের তালিকার দিকে তাকাই।

আগেই বলে এসেছি যে, হেয়ার সকাল বেলায় ঘুম থেকে উঠে চা, আর পেট ভরে জল খাবার খেয়ে, বেলা দশটা নাগাদ তাঁর পাল্কি বোঝাই করতেন বই আর ওষুধে; তারপরে তিনি নিজে সেই পাল্কির এক কোণে একটু জায়গা করে নিলে, তা চলতে শুরু করতো—হু-হুম্না হু-হুম্না শব্দ তুলে।

প্রথমে পাল্কি এসে থামতো বৌবাজারের আরপুলির পাঠশালায়। এখানে পৌঁছেই প্রথমে তিনি ভাল করে পরীক্ষা করতেন ছেলেদের হাজিরা খাতাটি। প্রথমে যারা যারা গর-হাজির থাকতো তাদের একটা তালিকা তৈরী করে নিতেন তিনি। তারপর বিদ্যালয় পরিচালনা সম্পর্কে সুবিধা-অসুবিধা, টাকা-কড়ির অবস্থা, ইত্যাদির তদারক করতেন। কখনও বা ক্লাসঘরগুলোর সামনে পেতে রাখা একটা তক্তপোষের ওপর বসে আশে পাশের ছেলেদের প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখতেন।

কোনো সময়ে প্রত্যেকটি শ্রেণীর মধ্যে ঢুকে ছাত্রদের পৃথক পৃথক ভাবে খোঁজ-খবর নিতেন। প্রায় প্রত্যেকেরই অগ্রগতির দিকে সজাগ পিতার মত তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিতেন তিনি। মাষ্টার মশাইদের কথা যেমন শুনতেন, ছাত্রদের কথাও তেমনি শুনতেন।

যারা ভালো ছেলে—যাদের বুদ্ধি আছে, চেষ্টা করলে যাদের প্রতিভায় দেশের, জাতির, পিতা-মাতার মুখ উজ্জ্বল হবে তাদের দিকে

সবচেয়ে বেশি করে নজর রাখতেন। মূঢ়-ম্লান-ক্লিষ্ট মুখগুলিতে আশা-উৎসাহ সঞ্চার করতে হেয়ারের চেষ্টায় কোনো বিরাম দেখা যেতো না। চারা গাছকে যেমন রোদ্দুরের তেজ থেকে বাঁচানোর জন্যে আচ্ছাদন দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়, তেমনি হেয়ারও অঙ্কুরিত মানব-বীজগুলিকে সমস্ত রকম তাপ থেকে আপন জীবন দিয়ে ঢেকে রাখতে চাইতেন।

এই ভাবে কয়েক ঘণ্টা কাটানোর পর হেয়ারের পাল্কি চল্‌লো 'হিন্দু কলেজ'—সেখান থেকে পটলডাঙ্গা বা সিমলার স্কুল। পটলডাঙ্গা-আরপুলি-সিমলা-হিন্দু কলেজ-কলুটোলার পাঠশালা—সর্বত্র, সব জায়গায় সদাহাস্যময় হেয়ারের সদা উপস্থিতি ও নির্দেশ আলো-বাতাসের মতো জড়িয়েছিলো। তিনি এবং সেদিনকার কোলকাতার শিক্ষা-ব্যবস্থা—এই দুটোই ছিলো সমার্থক। জল ছাড়া যেমন মাছ বাঁচে না, অক্সিজেন ছাড়া যেমন আলো জ্বলে না—বস্তু মাত্রেই যেমন মাধ্যাকর্ষণের অধীন তেমনি ১৮১৬-১৮৪২-এর নব্যবঙ্গের সমস্ত ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থা ও পদ্ধতি হেয়ারকে আশ্রয় না করে বাঁচতে পারেনি। তাঁরই হৃদয়-গহ্বরের সহানুভূতি-রস পান করে সেদিনের শিক্ষা-ভ্রূণ প্রাণ পেয়েছে এবং অবশেষে তাঁর সহৃদয় ধাত্রীত্ব লাভ করে সে আধুনিক ভারতের আলো চোখে নিয়ে ভূমিষ্ঠ হয়েছে।

হেয়ারের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে চালিত বিদ্যালয়গুলির কোন একটার ছুটি হয়েছে—বিকেলের দিকে। তার দরজায় ভিজে তোয়ালে হাতে দেবদূতের মত প্রসন্ন মুখে একজন সাহেব দাঁড়িয়ে আছে। মাঝে মাঝে খপ্ করে এক একজনের অপরিচ্ছন্ন দেহটাকে ধরে ফেলে মায়ের মমতায় মুছিয়ে দিচ্ছেন, আর মুখে বিড় বিড় করে বলছেন ঃ তোমাদের বুদ্ধি হবে কবে। শুধু লেখাপড়া করলেই হয় না, একটু পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকতে হয়। শরীর হচ্ছে মন্দির—মন্দিরে ভগবান থাকে। তোমরা হিন্দু হয়ে সেই মন্দিরকে এইভাবে অপরিচ্ছন্ন রাখো ?

বাড়ীতে বোলো আমি এইরকম নোংরামি পছন্দ করি না। তুমি আমার বিনা বেতনের ছাত্র—আমি তোমার কাছ থেকে পরিচ্ছন্ন থাকার বেতন চাই। এই বেতন না পেলে তোমার নাম কাটিয়ে দেবো।

এইভাবে যতখানি পারেন—যতজনকে পারেন তোয়ালে দিয়ে গা মুছিয়ে দেন। পরিষ্কার থাকার অভ্যাস গড়ে তোলার চেষ্টা করেন,—বিশেষ করে যে সমস্ত জাতের লোকেরা নোংরামির জন্যে কুখ্যাত তাদের দিকেই তাঁর নজর ছিল সবচেয়ে বেশী।

এতক্ষণ বুঝতে কোনই অসুবিধা হয়নি যে, এই সাহেবটি হেয়ার ছাড়া আর কেউ নয়।

হেয়ারের এই পরিচ্ছন্নতার বাতিক সেদিনের একজন স্বনামধন্য ব্যক্তির বাল্য-জীবনের সূচনা-কাণ্ডে কি ভীষণ ক্ষত সৃষ্টি করতে উদ্যত হয়েছিলো এখানে তা একটু বলা প্রয়োজন। এবং সে কথা বলি সেদিনের অন্যতম প্রখ্যাত পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর ভাষায়। তিনি লিখছেন: 'এইরূপে প্রায় দুই মাসেরও অধিক কাল গত হইল। শেষে হেয়ার বুঝিলেন এ বালক ছাড়িবার পাত্র নয়, বিদ্যাশিক্ষা বিষয়ে ইহার অতিশয় আগ্রহ। তখন তাঁহাকে ফ্রী বালকের দলে লইতে স্বীকৃত হইলেন। এই অবস্থায় এক নূতন বিঘ্ন আসিয়া উপস্থিত হইল। স্কুলের বালকদিগের পরিচ্ছন্নতার দিকে হেয়ারের অতিশয় দৃষ্টি ছিল। বালকগণ যেরূপ অপরিষ্কার ও অপরিচ্ছন্ন অবস্থাতে স্কুলে আসিত তাহা দেখিয়া তিনি ক্লেশ পাইতেন।··· বালকদিগকে পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন রাখিবার জন্য তিনি ফ্রী বালকদিগের সম্বন্ধে এই নিয়ম করিয়াছিলেন যে, তাহাদিগকে স্কুলে প্রবিষ্ট করিবার সময় তাহাদের অভিভাবকদিগকে একখানা একরারনামা লিখিয়া দিতে হইবে যে, কোন বালক যদি অপরিচ্ছন্ন অবস্থাতে স্কুলে আসে তাহা হইলে অভিভাবককে জরিমানা দিতে হইবে।

'লাহিড়ী মহাশয়কে ভর্তি করিবার সময়ে সেই প্রশ্ন উঠিল। হেয়ার

বলিলেন,—তাঁহার জ্যেষ্ঠকে উক্ত প্রকার একরারনামা লিখিয়া দিতে হইবে। কেশবচন্দ্র ধর্মভীরু লোক ছিলেন। তিনি ভাবিলেন আমি যখন কলিকাতায় থাকি না, তখন সহোদর কি অবস্থাতে প্রতিদিন বিদ্যালয়ে যাইতেছে তাহা দেখা আমার পক্ষে সম্ভব নহে ; এরূপ স্থানে আমি কিরূপে প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করি। তিনি এক প্রকার নিরাশ হইয়া ছাড়িয়া দিলেন।'

শুধু মায়ের মত স্নেহ দিয়ে-তিরস্কার করে, কেবলমাত্র রুচি সৃষ্টিতেই হেয়ার তৎপর ছিলেন তা-ই নয়—আজ যারা ছাত্র আগামী কাল তারা নাগরিক হবে। তাই কেবল পরীক্ষা পাশ নয়, সুরুচি-বিশুদ্ধ নৈতিকতা নিয়ে তারা যেন জীবনে প্রতিষ্ঠা পায় এই মৌলিক বিষয়েই হেয়ার দৃষ্টি দিয়েছিলেন। ভিত দৃঢ় না হলে যেমন গোটা বাড়ীটাই নড়বড়ে হয়ে যায়, তেমনিই ভিত থেকেই হেয়ার গোটা জাতটাকে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। এ বিষয়ে তিনি ছিলেন বজ্রের মতোই কঠিন, নিয়তির মতোই সুনির্দিষ্ট এবং কালের গতির মতোই অপ্রতিরোধ্য। অন্যদিকে ছাত্রদের দুঃখে দারিদ্র্যে যতই নারীসুলভ কুসুম-কোমল প্রকৃতিরই তিনি হোন না কেন!

বিশেষ করে সেদিনের কোলকাতায় এদিকে নজর দেওয়ার দরকার ছিলো সবচেয়ে বেশী। অনেকে প্রশ্ন করতে পারেন যে, আজকে কি যুবসম্প্রদায়ের মধ্যে উন্মার্গগামিতা, অসদাচার, নৈতিক অধঃপতন আরো বেশী প্রকট ও বিচিত্রতর হয়ে নিত্য-নতুন রূপে আত্মপ্রকাশ করছে না? অধিকন্তু আজ আর এই জিনিষ কেবল কোলকাতা বা এইরকম কোনো একটা শহরের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে নেই, সমগ্র দেশের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ঢুকে গেছে। এ সবই ঠিক। কিন্তু এর সঙ্গে এও মনে রাখতে হবে যে উক্ত রোগের পাশে পাশে তাকে প্রতিরোধ করারও নানা পথ এবং পদ্ধতিও আজ গড়ে উঠেছে দেশের মধ্যে। এবং ইচ্ছে করলেই উক্ত নৈতিক বা সামাজিক রোগটিকে সমূলে

উৎপাটিত করে ফেলা যায়। কিন্তু সেদিন সেই ইচ্ছা বা প্রতিরোধের প্রতিষেধকটিই আবিষ্কৃত হয় নি—হেয়ারের মতো দু-একজন সমাজ-মনস্ক ব্যক্তি আত্মগত সৎ প্রেরণার বশবর্তী হয়ে যতটুকু পারতেন ততটুকুই করতেন।

এবং এবিষয়ে অসীম আত্মবিশ্বাস নিয়ে হেয়ার তাঁর শিক্ষার্থী ছাত্রদের ওপর নির্বিচার শাসন চালাতেন—কারুর রোষ বা উষ্মার তোয়াক্কা করতেন না।

কোথায় কোন বাবুর বাড়ী যাত্রার আসর বসেছে, কোথায় কোন আখড়াই আসরে সমস্ত রকমের কুরুচি পচা নর্দমার মতো ঘুলিয়ে উঠেছে, আর সেইখানে পরম আনন্দে হেয়ারের অপরিণত বয়সের কুবুদ্ধিপক্ক এক পলাতক ছাত্র জায়গা নিয়েছে। হঠাৎ সেই আসরের মধ্যে দীর্ঘদেহী এক সাহেব এসে খপ্ করে ঐ কুরুচিলুব্ধ বালকটিকে যেন ছোঁ মেরে তুলে নিয়ে—বেশ খানিক তিরস্কার করে, বাড়ী পৌঁছে দিয়ে এলেন। সেদিনের কোলকাতার সবাই জানেন যে ঐ সাহেবের নাম ডেভিড হেয়ার।

সেদিন মাহেশের স্নানযাত্রার মেলা ছিলো সবচেয়ে কুখ্যাত পরব। বেনিয়ান-মুৎসুদ্দি-দেওয়ান আখ্যাপ্রাপ্ত বাবুদের বেলেল্লা আচরণে সেই পরব যে চেহারা নিতো তা আজকের ভাষায় লিখতে গেলে আইনভঙ্গের দায়ে ঠেকতে হবে। এই আচরণে ও প্রমত্ততাতে লুব্ধ হয়ে পড়ুয়া বালকেরা ঐ সব বাবু-বজরায় হাজির হতো। এই খবর সে-দিনের সবাই জানলেও এই সমস্ত অপরিণত-বুদ্ধি কিশোরদের অনেকেই নিবৃত্ত করতো না। কিন্তু গোয়েন্দার মতো তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ও সাহস নিয়ে একজন গোরা গঙ্গার ঘাট থেকে ঘাটে ঘুরে ফিরছেন, আর জাওলার পাত্র থেকে মাছ তোলার মতো টপাটপ ঐ সব বখা ছেলেদের ধরে নিয়ে বাড়ীতে দিয়ে আসছেন। প্রয়োজন মতো শাসন, উপদেশ বা কড়া আদেশ দিচ্ছেন। এই গোরা সাহেবটিও হচ্ছেন ডেভিড হেয়ার।

ছেলেটি পড়াশুনায় ভালো। একটু যত্ন নিলে খুব ভালো ফল করবে। বাপ-মায়ের বা দেশের মুখ উজ্জ্বল করতে পারবে—কিন্তু বড়ই অমনোযোগী—ফাঁকিবাজ। ভীষণ কামাই করে। হেয়ারের নজরে এলো বিষয়টি। তিনি কদিন ধরে লক্ষ্য রাখতে লাগলেন ছেলেটির ওপর। শেষে একদিন তার বাড়ীতে গিয়ে হাজির হলেন।

বাড়ীর লোকেরা তো আকাশ থেকে পড়লো। সে কি! ছেলে তো রোজই পাঠশালায় যায়—ঠিক সময়ে বাড়ীও তো ফেরে। তবে? হেয়ারের কপালে চিন্তার রেখা পড়লো। একটুখানি কি ভাবলেন। তারপর হন হন করে চল্‌তে লাগলেন। তারপর এদিক-ওদিক, এপল্লী-ওপল্লী ঘুরে এক কুৎসিত জায়গা থেকে ঐ পলাতককে পাকড়াও করলেন। তারপর তাকে শাসন করে, কিছুটা নরমভাবে বুঝিয়ে বাড়ীতে ফেরৎ আনলেন। এবং বেশ কিছুদিন কড়া নজরে, শাসনে রেখে আস্তে আস্তে তাকে পরিবর্তিত করে দিলেন। এবং কালে সে দশের ও দেশের একজন প্রধান ব্যক্তি হয়ে উঠলো। এরকম অসংখ্য উদাহরণ আছে—হেয়ার এইভাবে প্রকৃত খ্রীস্টানদের মতো এ দেশের কালো মানুষগুলোকে অন্ধকার থেকে আলোয় ফিরিয়ে আনবার জন্যে প্রাণকে পর্যন্ত পণ করেছিলেন।

৮.

কেবল শাসন! কেবল মুখের তর্জন-গর্জনই শোনা গেল—কিন্তু অন্তরে নিয়ত বহমান স্নেহ ও করুণার নির্মল ধারার সন্ধান পাওয়া গেল না! এমনটা কি হতে পারে? না, পারে না। অন্তত মহামতি ডেভিড হেয়ারের ক্ষেত্রে পারে না।

এমনটা দেখা যায় যে পাহাড়ের কোনো এক জায়গায় একটা পাথরে চাঁই সরিয়ে দিলে বা সরে গেলে সেখান থেকে শীতল-নির্মল জলধারা বইতে স্বুরু করে দেয়। ক্রমে তার থেকে অনর্গল প্রস্রবণ ঝরতে থাকে এবং সেই জলধারাই সমতলে নেমে এসে নদী হয়। সেই নদীই তার দু-পাশের ক্ষেত-প্রান্তরকে করে তোলে সবুজ-শ্যামল শস্যপূর্ণ; ঠিক তেমনিই কঠিন শাসনের পাথরটাকে অতিক্রম করতে পারলেই হেয়ারের হৃদয় থেকে ক্ষরিত হতে থাকতো পবিত্র স্নেহ-পীযূষধারা—যা সেদিনের প্রত্যেকটি বাঙ্গালীকে সমৃদ্ধ করেছে।

ঠিক এই বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করে হেয়ারের কাছ থেকে উপকৃত একজন ছাত্র বাবু চন্দ্রশেখর দেব বলছেন: সেদিন আমি যখন তাঁর বাড়ী গিয়ে পৌঁছলাম তখন একেবারে কাক-ভেজা অবস্থা। আমি যেন এই মাত্র নেয়ে উঠলাম। আমাকে ঐভাবে ভিজে আসতে দেখে তিনি [হেয়ার] ভীষণ ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠলেন। প্রথমেই একটা তোয়ালে এনে আমাকে পরতে দিয়ে ভিজে-জামা-কাপড় ছেড়ে ফেলতে বললেন। কিন্তু সেই তোয়ালেটা আমার পরার পক্ষে ছোটো দেখে, আমার কিছু হবে না বলে, আমি ভিজে কাপড়েই থাকতে চাইলাম। কিন্তু তিনি আমার কোনো আপত্তি না শুনে একটা বেশ প্রমাণ

সাইজের টেবিল ক্লথ এনে আমাকে নিজে হাতে পরিয়ে দিলেন। এবং নিজের হাতে একটা রুমাল দিয়ে আমার মাথাটাও মুছিয়ে দিলেন। তারপর তিনি আমার ধুতিচাদরগুলো শুকনো করে তুলতে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। প্রথমেই তিনি নিজের হাতে সেগুলির জল নিংড়ে নিয়ে বেয়ারার হাতে দিয়ে একটি শুকনো জায়গায় রাখবার ব্যবস্থা করলেন। কিছুক্ষণ পরে বৃষ্টি থেমে গেল। হেয়ার একতালায় নেমে গিয়ে নিজের হাতে বারান্দাটা পরিষ্কার করে নিয়ে কাপড়-চাদরগুলি রৌদ্রে মেলে দিলেন—শুকোবার জন্যে।

এ শুধু একবার নয় বাবু চন্দ্রশেখরের জীবনে আরও একবার এমনই ঘটনা ঘটেছিলো।—অন্যদের জীবনে যে আরও কত—অসংখ্যবার, তার ঠিক কি ? চন্দ্রশেখরের কথাতেই শোনা যাক ঃ

আর একদিন হেয়ার সাহেবের বাড়ীতে গিয়েছিলাম বিকেল বেলায়। কথা বলতে বলতে সন্ধ্যে হয়ে গেল এবং কিছু পরে নামলো প্রচণ্ড বৃষ্টি। ক্রমে রাত বাড়তে থাকলো—কিন্তু বৃষ্টি আর কিছুতেই থামতে চায় না। এদিকে হেয়ারের রাতের খাবারের সময় এসে গেলে, আমি বাড়ী ফিরে যেতে চাইলাম। কিন্তু তাঁর কাছ থেকে কিছুতেই ছাড়া পাওয়া গেল না। তাঁর বাড়ীর দরজার গোড়াতেই এক মিঠাইওয়ালার দোকান ছিল। তিনি সেই ময়রাকে ডেকে পাঠিয়ে বলে দিলেন যে আমি সন্দেশ বা অন্য কোনো মিষ্টি আর কলা ইত্যাদি যত খেতে পারি তা যেন আমায় দেওয়া হয়। আমি দোকানে চলে গেলাম খেতে, আর উনি নিজের রাতের খাবার খেতে বসলেন। দোকান থেকে পেট ভরে খেয়ে ফিরে দেখি তিনি তখনও খাচ্ছেন। তাঁর নির্দেশে আমাকে তাঁর পাশে বসতে হলো। রাত প্রায় সাড়ে আটটা-নটার সময় দেখা গেল বৃষ্টি প্রায় ধরে গেছে। তাঁরও খাওয়া শেষ। আমারও পেট ভর্তি মিষ্টি আর কলায়।

হেয়ার সাহেব হাতে একটা মোটা লাঠি নিয়ে বললেন ঃ চল

তোমাকে একটু এগিয়ে দিয়ে আসি। পথে গোরারা আছে। মাতালদেরও বেরুবার সময় এটা। তোমাকে একলা যেতে দিতে পারি না।

দু-জনে পথ চলতে আরম্ভ করলাম। আমার বাড়ী ছিল পটুয়াটোলা লেনে। পথে যেতে যেতে চলার ক্লান্তি দূর করার জন্যে ছোটদের ভালো লাগে এমন সব গল্প একটার পর একটা বলে যেতে লাগলেন। বউবাজারের মোড়ের কাছে এসে আমি বললাম: আমি এখান থেকে একলা বেশ চলে যেতে পারবো।

হেয়ার বললেন: না চল মাধব দত্তের বাজারের কাছ পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে আসি।

এই রকম ভাবে চূণাগলিতে এসে পৌঁছবার পর তাঁর মধ্যে আমি কিছু উদ্বেগের ছায়া লক্ষ্য করলাম। তিনি আমাকে বলতে থাকলেন: এই জায়গাটা হচ্ছে মাতাল লোকেদের আড্ডা মারবার জায়গা; তোমাকে নিরাপদে পৌঁছে দেবার জন্যে হয়তো তাদের সঙ্গে মারামারি করতে হতে পারে। তবে এই মারামারিতে শয়তানগুলোর যে অবস্থা হবে তার জন্যে আমি দায়ী নই।

যাক্ এইরকম ভাবে তো আমরা পটলডাঙ্গার পুরানো থানার কাছে এসে হাজির হলাম। এখন কলেজ স্ট্রিটে, যেখানে হেয়ারের সমাধি রয়েছে, তার প্রায় উল্টোদিকে ছিলো হেয়ারের দেওয়ান বৈদ্যনাথ দাসের বাড়ী। আবার তার ঠিক উল্টোদিকে ছিলো পটলডাঙ্গার পুরাতন থানা। নতুন রাস্তাগুলো তখনো তৈরী হয়নি, আশে পাশের রাস্তা ছিলো ভীষণ সরু আর নোংরা। এখানে পৌঁছানোর পর তিনি আমায় বললেন: আমি এখানে দাঁড়াচ্ছি; এখান থেকে তোমার বাড়ী একশ গজের বেশী নয়। তুমি বোধহয় এখান থেকে একাই বাড়ী যেতে পারবে?

আমি পরম নিশ্চিন্তে বললাম: আপনার আর আসার দরকার

নেই। ঐ তো আমার বাড়ী দেখা যাচ্ছে। আপনি বাড়ী ফিরে যান। এই বলেই আমি আমার বাড়ীর দিকে দৌড় লাগালাম।

আমি বাড়ী পৌঁছানোর মিনিটখানেক পরেই আমাদের গলির ভেতরে—আমার বাড়ীর খুবই কাছে—'চন্দর' 'চন্দর' বলে এক সাহেবী গলায় চিৎকার শোনা গেল। আমি জামা-কাপড় পালটাচ্ছিলাম। বাবা বাড়ীর বাইরে বেরিয়ে দেখলেন যে আমাদের বাড়ীর একটু দূরে দাঁড়িয়ে মূর্তিমান হেয়ার। পটুয়াটোলার গলির ঠিক কোন বাড়ীটা যে আমাদের হেয়ার তা জানতেন না, তাই রূপনারায়ণ ঘোষালের বাড়ীর দক্ষিণপূর্ব কোণে দাঁড়িয়ে তিনি ডাকাডাকি শুরু করেন।

বাবা বাড়ীর বাইরে বেরিয়ে হেয়ারকে বললেন ঃ কি খবর সাহেব, আপনার কি চন্দরকে প্রয়োজন ?

হেয়ার ঃ আমি জানতে চাইছিলাম যে চন্দর বাড়ীতে পৌঁচেছে কি না ?

আমার বাবা ঃ হ্যাঁ সে বাড়ী পৌঁছে জামা-কাপড় পালটাচ্ছে। হেয়ার এই উত্তর পেয়ে সন্তুষ্ট চিত্তে তাঁর বাড়ীর দিকে ফিরে চললেন।

এরকম অশ্রুতপূর্ব ঘটনার উল্লেখ করে শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় মন্তব্য করেছেন ঃ 'হায়, সে প্রেম কিরূপ যাহা এতদূর বালকটির সঙ্গে আসিয়াও তৃপ্ত হইতে পারে না, আবার ভাবে—ছেলেটা ঘরে পৌছিল কি না একবার দেখি!' সত্যি এই প্রেমের নমুনা মানব সভ্যতার ইতিহাসে আর তো দেখি না।

এই রকম আরও অজস্র ঘটনার কথা সে যুগের মানুষের ভাষায় সোনার অক্ষরে, কৃতজ্ঞতার সঙ্গে লেখা আছে। সবগুলোর উল্লেখ-মাত্র করলেই একটি বৃহৎ গ্রন্থ হয়ে যেতে পারে। মোট কথা এই যে, যেখানেই মানুষ দুঃখী,—যেখানেই সে রোগ-কাতর,—সেইখানেই হেয়ার হাজির। কার অসুখ করেছে হেয়ার তার পাশে বসে সেবা করছেন, ওষুধ-পথ্য দিচ্ছেন। কে টাকা-পয়সার অভাবে লেখা-পড়া

করতে পারছে না সেখানে হেয়ারের উদার দান তাকে জীবনে প্রতিষ্ঠিত হতে সাহায্য করছে। এমনকি সেই সেবাব্রত থেকে কেউ তাঁকে বঞ্চিত করলে তিনি খুবই অসন্তুষ্ট হতেন।

এই বিষয়ে মনীষী রাজনারায়ণ বসু বলছেন : 'একবার আমি জ্বর থেকে ভালো হয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যাই। তিনি আমার দীর্ঘ অনুপস্থিতির কারণ জানতে চাইলেন। আমি বললাম আমার জ্বর হয়েছিল, তাই তাঁর সঙ্গে এর মধ্যে যোগাযোগ করতে পারিনি। এতে তিনি আমার ওপর খুবই অসন্তুষ্ট হয়ে উঠেছিলেন। কারণ; কেন আমি তাঁকে আমার অসুখের খবর দিইনি, তাহলে তো তিনি ওষুধপত্র নিয়ে আমাকে দেখতে যেতে পারতেন। আমার অসুখে পাশে থাকতে পারতেন।

এই করুণাঘন চিত্তের পরিচয় কেবল যারা তাঁর ছাত্র বা পরিচিত তারাই লাভ করতো এমন নয়। সম্পূর্ণ অপরিচিত, অজানিত বা অতি সাধারণ ব্যক্তিও লাভ করতো তাঁর মানব-কল্যাণকামী আত্মার পরিচয়। যেমন : একদিন হেয়ার এবং তাঁর এক এদেশীয় বন্ধু বসেছিলেন তাঁর বিদ্যালয়ের একটি ঘরে। এমন সময় এক দরিদ্র বিধবা এসে সকরুণভাবে প্রার্থনা জানাল যে তিনি যেন তার একমাত্র ছেলেকে তাঁর পাঠশালায় ভর্তি করে নেন। এবং সে খুবই গরীব, তাই তার ছেলের জন্যে পয়সা খরচ করতেও পারবেন না। হেয়ার জানালেন যে তাঁর পক্ষে এই অনুরোধ রক্ষা করা কোনো ভাবেই সম্ভব নয়। কারণ, তাঁর পাঠশালার সবচেয়ে নীচু শ্রেণী – যেখানে ছেলেটিকে ভর্তি করতে হবে—সেখানে একদমই জায়গা নেই। অনেক আগেই যতগুলি ছাত্র ধরে সবগুলিকেই নিয়ে নেওয়া হয়ে গেছে।

এই নিরাশার কথা শুনে বড় আশা নিয়ে আসা বিধবাটি সবায়ের সামনেই হাঁউমাউ করে কেঁদে উঠলেন। এবং তারপর ছেলের মন্দ ভাগ্যের জন্যে সারা রাস্তা চিৎকার করে কাঁদতে কাঁদতে ভাঙ্গা বুক

নিয়ে বাড়ী ফিরলেন। এই ঘটনায় তাঁর দয়ালু হৃদয় একেবারে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়লো। বিধবার কান্নার রেশ দূর পথে মিলিয়ে যাবার পরেই হেয়ার তাঁর বন্ধুটির দিকে ফিরে বললেন যে, তিনি [হেয়ার] বিধবাটির প্রকৃত অবস্থা জানার জন্যে খুব ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। ফলে, ঠিক হলো হেয়ার আর তাঁর বন্ধুটি মিলে সন্ধ্যেবেলায় সেই বিধবাটির বাসা খুঁজে বার করবেন এবং চেষ্টা করবেন তার জন্যে কিছু করা যায় কিনা!

স্ত্রীলোকটি তার কান্নার ফাঁকেই বলেছিলো যে সে সীতারাম ঘোষ লেনের এক বস্তিতে থাকে। সেই সূত্র ধরে খুঁজতে খুঁজতে সন্ধ্যের কিছু পরে হেয়ার আর তাঁর বন্ধু, বিধবাটির বাড়ীতে এসে হাজির। সে হেয়ারের ডাকে তার ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে বাইরে এলো।

কিন্তু হেয়ারের সামনে এসে তার মুখের কথা বন্ধ হয়ে গেল। চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলো সে। বড় বড় ফোঁটায় চোখের জল তার দু-গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়তে লাগলো। এই দৃশ্য দেখে উদার হৃদয় হেয়ার অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়লেন। কোমল অনুভূতিতে আচ্ছন্ন হয়ে গেল তাঁর মন। সব নিস্তব্ধ—সবাই চুপচাপ। শেষে নীরবতা ভঙ্গ করে হেয়ার মেয়েটিকে কথা দিলেন যে তাঁর ছেলের শিক্ষার ভার তিনি নিজের হাতে নিচ্ছেন। তাছাড়া যতদিন না তার ছেলে রোজগার করতে শেখে ততদিন তিনি প্রতিমাসে চারটি করে টাকা দিয়ে যাবেন। তাঁর এই কথায় বিধবাটি প্রথমে বিস্ময়ে কোন কথাই বলতে পারলেন না। কিছু পরে তাঁর চোখ দিয়ে দরদর করে জল পড়তে লাগলো। কি বলবে সে,—তাই কেবল কেঁদেই চললো। শেষে অনেক সান্ত্বনায় সে কান্না থামিয়ে হেয়ারের প্রশংসা জুড়ে দিলো। হেয়ার মানুষ নন—তিনি দেবদূত, গরীবের ভগবান।

হেয়ার নিজের প্রশংসা শুনতে ভালবাসতেন না, তাই বন্ধুকে নিয়ে তাড়াতাড়ি সেখান থেকে চলে এলেন।

৯.

হৃদয় উজাড় হয়ে গেছে। কোলকাতার সামান্য এক বিদেশী ঘড়িওয়ালা কৌশল বা বিদ্যা বা বিত্তের জোরে নয়, সুউচ্চ হিমালয়ের মতো প্রাণাবেগের সাহায্যে সাহেব অথবা বাঙালীদের হৃদয়ের খুব কাছে এসে দাঁড়ালেন। প্রথম প্রথম সরকারী প্রশাসনের সুশিক্ষিত ও সুউচ্চ ইংরেজ কর্মচারীরা হেয়ার সম্বন্ধে যে তুচ্ছন্মন্যতায় [Inferiority Complex] ভুগছিলেন, তা কাটিয়ে উঠতে লাগলেন। এদেশীয় ধনী বাবুরাও হেয়ারকে ভারতবন্ধুরূপে জ্ঞান করতে লাগলেন। হেয়ারও প্রথম দিককার ডিগ্রির ছাপমারা লেখাপড়া না জানার এবং বৃত্তিগত অকৌলীন্যের ইতস্তত ভাব কাটিয়ে ফেলেছেন। অন্তরের অন্তস্তলে লুক্কায়িত মানব-প্রেমের প্রস্রবণ ততদিনে বাঁধন হারা পাগলা ঝোরা হয়ে বেরিয়ে পড়েছে। সজীব কচি-কাঁচা দেশীয় বালকদের কলকাকলী হেয়ারকে সবকিছু ভুলিয়ে দিয়েছে ;—হেমন্তের গোধুলিতে সকল কৃষক যেমন তার সোনালী ধান ক্ষেতের দিকে তাকিয়ে পরিতৃপ্তির আবেগে অন্তরে টগবগ করতে থাকে।

এরই ফলে হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার আড়াই বছরের মধ্যেই ঐ কলেজ থেকে হেয়ারের কাছে আহ্বান গেল : আপনি এই সামান্য কয়েকদিনের মধ্যে এদেশের শিক্ষাব্যবস্থার সার্বিক উন্নতি—পরিপুষ্টি ও প্রসারের জন্যে যে সুচিন্তিত মতামত দিয়েছেন, পরিশ্রম ও অর্থ নির্বিকারে ব্যবহার করেছেন তারই কৃতজ্ঞতা স্বরূপ আপনি যদি হিন্দু কলেজের পরিদর্শকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন তবে আমরা খুবই কৃতজ্ঞ হই। [হেয়ারকে হিন্দু কলেজ পরিচালক সমিতির পত্র ১৮১৯-এর ১২ই জুন]। এর উত্তর হেয়ার কি দিয়েছিলেন তা

আমাদের জানা নেই, তবে হিন্দু কলেজের য়ুরোপীয় সম্পাদক ক্যাপ্টেন এফ. আরভিন এই সময়ে অসুস্থ হয়ে কোলকাতা ছেড়ে চলে গেলে, হেয়ারকে তাঁর জায়গায় হিন্দু কলেজে পাঠানো 'কোলকাতা স্কুল সোসাইটি'র ছাত্রদের তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হয়। এই পোষাকী কাজের বাইরেও তিনি হিন্দু কলেজের সার্বিক উন্নতি ও কল্যাণের জন্যে তাঁর জীবনের শেষ নিঃশ্বাসটুকু পর্যন্ত ব্যয় করেছিলেন, তার কথা ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লেখা আছে।

কেবল তাই-ই বা কেন 'কোলকাতা স্কুল সোসাইটি'র য়ুরোপীয় সম্পাদক ডবলিউ. এইচ. পিয়ার্স অসুস্থ হয়ে পড়লে হেয়ারকে তাঁর জায়গায় কাজ চালাতে অনুরোধ করা হয়। তিনি দ্বিধাহীন চিত্তে তাতে রাজী হন। এটা ১৮২২ সালের কথা। আমরা আগেই বলে এসেছি যে পটলডাঙ্গার স্কুলের সঙ্গে হেয়ারের যোগ—ঐ বিদ্যালয়ের জন্মদিন [১৮২৩] থেকেই। এই স্কুলের খরচের অনেকখানি আসতো হেয়ারের পকেট থেকে। যদিও এই স্কুলটি কোলকাতা স্কুল সোসাইটির নিজস্ব তত্ত্বাবধানে চলতো, ঐ সোসাইটি কিছু টাকাও দিতো, তবুও হেয়ারের শ্রমানুকূল্য ও অর্থ-সাহায্য এর পশ্চাতে কায়ার পেছনে ছায়ার মতোই সম্পৃক্ত হয়ে থাকতো।

এই সময় থেকেই হিন্দু কলেজ ও স্কুল সোসাইটি টাকার অভাবে খোঁড়াতে আরম্ভ করলো। এত সাধের লেখাপড়া বোধহয় লাটে উঠলো। কি করা যায়! দয়ার দান দিয়ে তো চিরদিন কাউকে বাঁচিয়ে রাখা যায় না। সেই যে কথার বলে : 'নিত্য রোগী দেখে কে, নিত্য নেই দেয় কে ?' নিত্য ভিখারীর অভাব কে মেটাবে। সকলেই চিন্তিত হয়ে পড়লো। এমন সময় দেশীয় শিক্ষা-শিশুর পালক-পিতা ডেভিড হেয়ার এগিয়ে এলেন। তিনি পরামর্শ দিলেন সরকারী সাহায্যের জন্যে আবেদন করা হোক। কেননা স্থায়ী অনুদান না পেলে স্থায়ী ভাবে এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানগুলোকে বাঁচিয়ে রাখা যাবে

না। হেয়ারের পরামর্শ সকলেই একবাক্যে মেনে নিলেন। সরকারও দেখলো যে এদেশের জন্যে আমাদেরও কিছু করার আছে। এইভাবে সরকারের সঙ্গে দেশীয় শিক্ষাব্যবস্থার যোগ স্থাপিত হলো।

কেবল এখনই কেন, হিন্দু কলেজ তার জন্মের দু-বছরের মধ্যেই আরো একবার ভয়ঙ্কর টাকার অভাবের রোগে মরণাপন্ন হয়ে, যায় যায় অবস্থা। হঠাৎ হেয়ারের মাথায় বুদ্ধি গজালো যে এর সাহেব সম্পাদকের জন্যে তিন-শ টাকা, আর বাঙালী সম্পাদকের জন্যে এক-শ টাকা করে মাসে খরচ করার কোনো দরকার নেই। দেশের ছেলেদের লেখাপড়া শেখার জন্যে—সেবা কর্মের জন্যে—মাসে মাসে আবার মাইনে কি? মা কি ছেলের লালন-পালনের জন্যে মাইনে নেন?—হেয়ারের মতে সবাই বলে উঠলেন ঠিক! ঠিকই তো। সাহেব সম্পাদক আরভিন পদত্যাগ করলেন। আর বাঙালী সম্পাদক বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায় বিনা টাকাতেই কাজ করে যেতে রাজী হয়ে গেলেন। এতে সেবারের মতো হিন্দু কলেজ বেঁচে গিয়েছিলো।

এমনি করে তখনকার সমস্ত কিছুতেই সর্বসিদ্ধিদাতা—সর্বকর্মক্ষম হেয়ার—হেয়ার—ডেভিড হেয়ারকে আমরা দেখতে পাচ্ছি। কোথায় হিন্দু স্কুলের জন্যে জায়গা হচ্ছে না—বেড়াল নাড়ার মত একবার এর দোরে, একবার ওর দোরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। হেয়ার পরামর্শ দিলেন যে: সরকার তো সংস্কৃত শিক্ষার প্রসারে অর্থব্যয় ও গৃহ-নির্মাণের জন্যে টাকা খরচ করতে চাচ্ছেন। তাতে যে বাড়ী হবে সেখানে হিন্দু কলেজেরও একটা ব্যবস্থা হোক। হেয়ার বর্তমান গোলদীঘির উত্তর দিকে যে জায়গা ছিলো তা বেশ কমদামে ছেড়ে দিলেন। ফলে, সংস্কৃত কলেজের জন্যে যে বাড়ী হলো সেখানে হিন্দু কলেজও উঠে এলো [১৮২৫]।

স্কুল সোসাইটি ভীষণ টাকার অভাবে পড়েছে। হেয়ার তাকে এককালীন ছ-হাজার টাকা দান করলেন। অবশ্য অনেক আগে

থেকেই হেয়ার এই প্রতিষ্ঠানকে এক-শ করে টাকা বছরে চাঁদা দিয়ে আসছিলেন। আরও কত জায়গায় কত ভাবে যে হেয়ারের দান সেদিন ছড়ানো ছিলো, তার পরিপূর্ণ ইতিহাস কেউ কোনদিন জানতে পারবে না। কারণ, হেয়ারের ডান হাতের দানের খবর বাঁ হাতের কাছে কেনোদিন পৌঁছোয় নি। এইরকম একটি ঘটনা রামতনু লাহিড়ী মহাশয়ের জীবনে ঘটেছিলো। এই ঘটনাটি জানিয়ে শিবনাথ শাস্ত্রী লিখেছেন ঃ 'লাহিড়ী মহাশয় বলিয়াছেন যে তিনি এক এক সময়ে এরূপ অর্থকৃচ্ছ্রের মধ্যে পড়িতেন যে ভাবিয়া কুল কিনারা পাইতেন না। একবার তাঁহার বন্ধু কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকট ৭।৮ টাকা কর্জ করলেন। তৎপরে একবার নিরুপায় হইয়া মহাত্মা হেয়ারের শরণাপন্ন হইতে হইল। হেয়ার কাহাকেও বলিবেন না এই প্রতিজ্ঞা করাইয়া, তাঁহাকে কিছু অর্থ সাহায্য করিলেন। তিনি হেয়ারের জীবদ্দশাতে একথা কাহারও নিকট ব্যক্ত করেন নাই।'

কলসীর জল গড়াতে গড়াতেই শেষ হয়। হেয়ার ঘড়ির ব্যবসা ছাড়লেন [১৮২০]। জায়গা জমি যা ছিলো তার কিছু নতুন তৈরী হচ্ছে এমন স্কুল-পাঠশালার জন্যে দান করলেন। কিছু বা নামমাত্র মূল্যে বিক্রি করলেন। যে সমস্ত জায়গায় তাঁর টাকাকড়ি গচ্ছিত ছিল সেগুলিও ফেল পড়লো। অথচ, এদেশের মানুষগুলিকে ভালবেসে তাদের কল্যাণের জন্যে যে সব দায়িত্বভার নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন তাদের চালিয়ে যাওয়ার প্রয়োজন হেয়ারের কাছে নিজের জীবন-ধারণেরও অধিক।

ওদিকে ট্যাঙ্ক স্কোয়ারের [বর্তমান লালদীঘি] পশ্চিমে যে বাড়ী তৈরী আরম্ভ করেছেন তা শেষ হয় নি। টাকার দরকার। এই প্রয়োজন মেটাতে তাঁকে চীন দেশে তাঁর এক আত্মীয়ের কাছে হাত পাততে হলো। তা-ও বা কত, সমুদ্রের কাছে গোষ্পদের মতো। শেষে এমনও মনে হতে লাগলো যে তাঁকে বোধহয় পাওনাদারের জ্বালায়

দেউলে খাতায় নাম লেখাতে হবে। কিন্তু যাঁরা মহান বা দেবপ্রতিম দুঃখ বা যন্ত্রণা ভোগ তাঁদের কাছে বুদ্ধির পরীক্ষা বা আধ্যাত্মিক উন্নতির সিঁড়ি মাত্র। আগুনে পুড়িয়ে যেমন সোনাকে খাঁটি করে নেওয়া হয়, তেমনি দুঃখের আগুনে এই সমস্ত মানুষদের যাচাই করে নেওয়া হয়। তাই হরেক রকম বাধাবিপত্তির সামনে পড়েও হেয়ার ধৈর্য হারালেন না—ধ্রুব তারার মতোই তিনি তাঁর বিশ্বাস এবং কর্তব্যে রইলেন অচঞ্চল। হেয়ার আস্তে আস্তে তাঁর বাড়ী তৈরীর কাজ শেষ করলেন, তারপর সেটিকে তাঁর পাওনাদারদের হাতে তুলে দিয়ে ঋণমুক্ত হলেন। মস্তবড় এক হীনাবস্থা থেকে মুক্তি পেলেন।

১০.

কথাতেই আছেঃ 'কালি কলম মন—লেখে তিন জন।' দেখা যাচ্ছে এদিকেও হেয়ারের জ্ঞান রয়েছে—নজর রয়েছে খুবই আন্তরিক। তিনি জানতেন তাঁর অধিকাংশ ছাত্রকেই, বিশেষ করে যারা ছিলো খুবই গরীব তারা বড় হয়ে চাকরীর ওপরেই নির্ভর করবে। আর সেই চাকরী হবে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই কলম পেশার। অর্থাৎ কেরাণীর। তাই ছেলেদের হাতের লেখা যাতে ভালো হয়—এ বিষয়ে যাতে তাদের মনোযোগ বিশেষভাবে আকর্ষিত হয় তার দিকে তিনি খুব কড়া নজর রাখতেন। প্রত্যেক ছাত্রকে রোজ, কম করে আধ ঘণ্টা সময় হাতের লেখা ভালো করার জন্যে ব্যয় করতেই হতো। হাতের লেখা ভালো হলে হেয়ার সন্তুষ্ট হতেন। আর তিনি খুশি হলে মিঠাই—খেলনা—খেলার বল—কখনও বা আর্থিক বা ঐ ধরণের কোনো কোনো সাহায্যও পাওয়া যেতে পারে। তাই ছাত্ররাও এই বিষয়টির উন্নতিতে খুবই যত্ন এবং আগ্রহ দেখাতো।

এটা হেয়ারই নিয়ম করেছিলেন যে পাঠশালার একেবারে নীচের দিককার ছেলেরা লিখবে কলার পাতায়। তার উপরের ছেলেরা তালপাতায়—খাগড়ার কলমে। আর একেবারে উঁচু শ্রেণীতে পৌঁছালে তবেই কাগজ ও হাঁসের পালকের কলম। তখন তো এমন কাগজ-খাতা-ফাউনটেনপেন বা ডটপেনের চলন ছিল না—তাই এই ভাবেই ছেলেরা লেখা মক্‌শো করে হাতের লেখায় হাত পাকাতো।

কতো ছোটো ছোটো বিষয়েই না হেয়ারের নজর থাকতো। বড় সমস্যা—বড় ঝড় তিনি যেমন অম্লান বদনে মাথা পেতে নিতেন, তেমনি ক্ষুদ্র বা সাধারণ বিষয়েও তিনি তাঁর আন্তরিক প্রীতি ও প্রেম

বিতরণে কার্পণ্য করতেন না। ঠিক যেমন মহা সমুদ্রের সুবিস্তৃত বুকে তিমি ইত্যাদি বড় বড় জীবজন্তুর সঙ্গে অতি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ঝিনুক-শামুক ও স্থান পায়।

হেয়ার এক স্কুল থেকে আর স্কুলে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। ভালো ছেলেদের উৎসাহ দিচ্ছেন। টিফিনের সময় ছেলেদের কাছে গিয়ে তদ্বির-তদারক করছেন;—তাদের কি সুবিধে-অসুবিধে হচ্ছে—তা জেনে নিচ্ছেন। কাউকে বা মিঠাই কিনে দিচ্ছেন। কোনো কোনো দিন দেখা যাচ্ছে যে তিনি ছেলেদের খেলার জন্যে বল কিনে এনেছেন—ছেলেরা তাঁকে ঘিরে ধরেছে। হাত থেকে বলটা কেড়ে নেবার চেষ্টা করছে। তিনি হাত দুটো তুলে বলটাকে উঁচু করে রেখেছেন, ছেলেরা লাফিয়ে লাফিয়ে চেষ্টা করছে হাত থেকে বলটা কেড়ে নেবার, কেউ বা গাছ বাইবার মতো করে তাঁকে আকড়ে ধরে উঠবার চেষ্টা করছে। ছেলেদের হৈ হৈ শব্দ আর ডেভিডের হো হো দরাজ হাসির শব্দ শুনে বয়স্করা বা শিক্ষকেরা অকুস্থলে এসে অবাক হয়ে যেতেন—এ কোন শুভ্রবসন স্বর্গের দেবতা—দেব শিশুদের নিয়ে আত্মপর-ভেদাভেদশূন্য বাৎসল্যলীলায় প্রমত্ত হয়েছেন।

তিনি পরিচালকমণ্ডলীর একজন হয়ে যেমন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন তেমনি বিদ্যালয় বা পাঠশালার শিক্ষকদের কাছে গিয়ে তাঁদেরও সুখ-দুঃখ সুবিধা-অসুবিধার খোঁজ নিতেন। আবার প্রয়োজনবোধে তাঁদের মৃদু-কোমল ও ভদ্র ভঙ্গীতে শাসনও করতেন। এখানে সেই রকম একটা ঘটনার উল্লেখ বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন বাবু গোবিন্দচন্দ্র দত্ত। তিনি বলছেন ঃ আমার বয়েস যখন ছয় কি সাত বছর আমি ভর্তি হয়েছিলাম হিন্দু কলেজে। সেখানে আমি একেবারে নীচের দিককার শ্রেণীর ছাত্র

ছিলাম। আমাদের শ্রেণীতে পড়াতে আসতেন এমন একজন বাঙালী শিক্ষক যাঁর বিশ্বাস ছিলো যে পাথর থেকে যেভাবে আগুন বের করা যায়, ঠিক সেইভাবেই ছাত্রদের উপযুক্ত পরিমাণে বেত্রাঘাত করতে পারলে তাদের মধ্যেকার প্রতিভার আগুন অবশ্যই প্রকাশিত হতে পারবে। আমাদের শ্রদ্ধেয় উক্ত মাষ্টার-মশাই এত নিষ্ঠার সঙ্গে এই কাজ করতেন এবং বার্ষিক পরীক্ষার দিন যতই এগিয়ে আসতো ততই একাগ্রতার সঙ্গে ও চক্রবৃদ্ধিহারে সেই কাজটি বাড়িয়ে যেতেন। যেমন, পরীক্ষার যখন আটাশ দিন বাকি থাকতো, তখন প্রত্যেকটি ভুলের জন্যে আমাদের দু-ঘা করে বেত খেতে হতো। যখন ছাব্বিশ দিন বাকি থাকতো, তখন তিন-ঘা। আবার যখন চব্বিশ দিন বাকি থাকতো পরীক্ষার, তখন প্রতিটি ভুলের জন্যে খেতে হতো চার ঘা করে বেত। এইভাবে দিন যত কমতো ভুল প্রতি বেত্রাঘাতের পরিমাণও তত বাড়তো।

আমার মনে আছে যে একবার যখন প্রত্যেকটি ভুলের জন্যে আট ঘা করে বেত খাবার দিন সেই সময়ে আমি একটা ভুল করে বসলাম। আমাকে ঐ শিক্ষক মহাশয় কাছে ডাকলেন আমার প্রাপ্য নিয়ে যাওয়ার জন্যে। ক্লাসের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ আমি কম্পিত বক্ষে তাঁর কাছে গিয়ে হাজির হলাম। কিন্তু আমার পাওনার এক অষ্টমাংশ অর্থাৎ এক-ঘা বেত খাওয়ার পরই আমি এমন গলা ছেড়ে কান্না জুড়ে দিলাম যে, তিনি একটু ইতস্তত করে বাকীগুলি পরের দিনে সংগ্রহ করার জন্যে ঋণ হিসেবে জমা রেখে দিলেন। এবং পরে ধীরে ধীরে আমার কাছ থেকে তিনি সবটাই আদায় করে নেবেন বলে জানালেন। আমার সৌভাগ্যই বলতে হবে যে, যে কোনো কারণেই হোক ঐ মাষ্টার মশায়ের ঐ ঋণ আমাকে আর শোধ করতে হয়নি।

আমার ঐ পূজনীয় শিক্ষকের ঐ অভ্যাস একদিন হঠাৎ খুবই নির্মম রকমের প্রখর হয়ে উঠেছিলো। শ্রেণীর অন্য একটি ছাত্র সেদিন সেই

নির্মমতার বলি হলো। ক্রমাগত আঘাতে ছেলেটি জর্জরিত হয়ে পড়লো। সে এক ভয়ঙ্কর দৃশ্য। যে ভাবেই হোক এই ঘটনার কথাটি হেয়ার সাহেবের কাণে পৌঁছালো।

রোজ যেমন করতেন ঠিক তেমনি ভাবে ঐ ঘটনার পরের দিন বিকেলের দিকে হেয়ার শ্রেণীগুলি একের পর এক পরিদর্শন করতে করতে আমাদের উক্ত শিক্ষক পরিচালিত শ্রেণীতে এসে হাজির হলেন। তাঁর মুখে মিটি মিটি হাসি। যেন তিনি কিছুই জানেন না। ঐ শিক্ষক মশাই বা আমরা বুঝতেই পারিনি হেয়ারের কোন বিশেষ উদ্দেশ্যে আগমন, না রোজকার মতই রুটিন মাফিক কাজ। যাই হোক, হেয়ার শ্রেণীতে প্রবেশ করে আমাদের শিক্ষক মহাশয়ের পাশে বসে অনেক্ষণ ধরে গল্প-গুজব করতে লাগলেন। তাঁদের কথাবার্তা বেশ নীচু গলাতেই হচ্ছিল। তাই আমরা জানতে পারিনি যে তাদের মধ্যে কি কথা হয়েছিল। তবে আমার এটুকু মনে আছে যে তাঁদের কথা বলার মধ্যে হেয়ার মিটি মিটি হাসছিলেন এবং আমাদের শিক্ষক মহোদয়টির মুখ অত্যন্ত গম্ভীর হয়ে উঠছিলো। এইভাবে বেশ কিছুক্ষণ চলার পর হেয়ার সাহেবের পকেট থেকে বেরিয়ে এলো একটি বিশেষ ধরণের ছুরি—অবশ্য এই ছুরিটি আমাদের কাছে খুবই চেনা। প্রায়ই তাঁকে আমরা এই ছুরিটি ব্যবহার করতে,—বিশেষ করে ছেলেদের কলম কেটে দেওয়ার কাজে—দেখেছি। এই ছুরি দিয়ে একেবারে গোড়া থেকে তালপাতার পাখার হাতলটি—যেটি শিশুপালপীড়ন অস্ত্র হিসেবে আমাদের কাছে এতদিন পরিচিত ছিলো,—কেটে দিলেন।

কাজ শেষ, তিনি চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। আমাদের দিকে অর্থপূর্ণ ও সকৌতুক দৃষ্টিতে তাকিয়ে হা হা করে একটু হেসে উঠলেন। তারপর একটু মাথা নুইয়ে তাঁর হাতে হাতলবিহীন তালপাতাটি ফেরৎ দিলেন—উদ্দেশ্য, ভবিষ্যতে মাষ্টার মশায়ের হাওয়া খাওয়ায় যেন ব্যাঘাত না হয়।

হেয়ার শিক্ষকটিকে যে শিক্ষা দিলেন, তাতে ব্যঙ্গের ঝাঁজ থাকলেও এমন কোন অবিনয় প্রকাশ পায় নি যা ছাত্রদের কাছে কু-শিক্ষার উদাহরণ হয়ে থাকতে পারে।

প্রহ্লাদকে তার বাবা হিরণ্যকশিপু জিজ্ঞাসা করেছিলো যে তোর নারায়ণ কি সর্বত্র আছে? প্রহ্লাদ উত্তরে বলেছিলো ঃ হ্যাঁ বাবা জলে-স্থলে-অনলে-অনিলে—এই বিরাট বিশ্বের সর্বত্র—স-ব-জা-য়-গা-য় তিনি আছেন। যেখানে তিনি নেই—সে বস্তু বা পদার্থেরও অস্তিত্ব নেই। এর উত্তরে ব্যঙ্গ করে দৈত্য-পিতা রাজপ্রাসাদের একটি সুউচ্চ স্তম্ভ দেখিয়ে পুত্র প্রহ্লাদকে বলেছিলো যে, এখানেও কি তোর নারায়ণ আছে? এই প্রশ্নের ফল কি হয়েছিলো তা আমরা সকলেই জানি। এবং এই পৌরাণিক কাহিনীর উদাহরণে আমাদের এইটুকুই বক্তব্য যে সেদিনের শিক্ষা-ব্যবস্থা ও তার ব্যবস্থাপক, অভিভাবক-বিদ্যালয় বা পাঠশালা এবং শিক্ষক-ছাত্র সংক্রান্ত সব কিছুর সঙ্গেই প্রহ্লাদের নারায়ণের মতো হেয়ার ওতপ্রোত ভাবে মিশে ছিলেন। ছুধের সঙ্গে যেমন জল মিশে থাকে। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের 'এদেশীয় শিক্ষা' শব্দটি ছিল যেন 'ডেভিড হেয়ার' নামটিরই প্রতিশব্দ। সুচতুর গোয়েন্দাদের মতই হেয়ার সবকিছুই নিজের নখদর্পণে রাখতেন। এখানে তেমন একটি ঘটনার উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে।

একবার একটি বেশী বয়েসের ছেলে—যে ছিল বদমায়েস প্রকৃতির এবং হাঙ্গামাবাজ,—তার শ্রেণীর একটি ছেলের পেছনে লাগলো। বড় ছেলেটি বড়লোকের ছুলাল, বখাটে, পড়াশুনায় অষ্টরম্ভা—অথচ শয়তানের ঝাড়। সে ঐ ঝগড়ার সূত্র ধরে ঐ ছোট ছেলেটির মারাত্মক ক্ষতি করতে চাইলো। সে এক দেশী কাগজের সম্পাদককে দিয়ে ছেলেটির নামে একটা ব্যঙ্গ কবিতা লিখিয়ে সেটিকে ছাপিয়ে ফেললো। তারপরের কাজ হলো কলেজের দেওয়ালে দেওয়ালে ঐ

ছাপা কাগজটা সেঁটে দেওয়া,—যাতে ঐটি পড়ে ছোট-ছেলেটিকে সবাই ঠাট্টা করতে পারে—নিন্দে বা কলঙ্ক রটাতে পারে। রাত প্রায় একটা। লণ্ঠন নিয়ে, কলেজের মালীদের কিছু ঘুস দিয়ে, কলেজের মধ্যে ঢুকে ঐ শয়তানটি তার কাজ আরম্ভ করে দিয়েছে। এমন সময় আপাদমস্তক বৃষ্টিতে ভেজা, গা বেয়ে জল ঝর্‌ছে এমন চেহারায় একজন জীবন্ত প্রাণী অকুস্থলে এসে প্রবেশ করলো। এই আগন্তুকটি কে তা-কি কল্পনা করা যায়?

হ্যাঁ! ইনি সেই সদাজাগ্রত, সর্বত্র বিরাজমান ডেভিড হেয়ার।

কোনো এক গোপন সূত্র থেকে এই রকম একটি ঘটনা ঘটবার সম্ভাবনার কথা হেয়ার জানতে পেরেছিলেন। তাই যথাসময়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে তাঁর অন্য এক ছাত্র,—যে সব বিষয়েই ছিল বিশিষ্ট—তাকে রক্ষা করার জন্যে মহামতি ও ছাত্রগতপ্রাণ হেয়ার ঝড়-ঝঞ্ঝা তুচ্ছ করে এমন কাজে এগিয়ে এসেছিলেন। এমন ঘটনা বিশ্বের ইতিহাসে দ্বিতীয় ঘটেছে কিনা আমাদের জানা নেই,—তবে এই সব ঘটনা থেকে আমাদের একথা বলতে দ্বিধা নেই যে আধুনিক বঙ্গীয়গণের পিতামহ-প্রপিতামহগণ হেয়ারের হাতেই মানুষ।

একটি উন্নত, পরিচ্ছন্ন এবং প্রগতিশীল মনেরও অধিকারী ছিলেন এই হেয়ার সাহেব। সর্বোপরি নানা ঘটনার মধ্যে দিয়ে আমরা তাঁর দয়ার্দ্রচিত্ততার পরিচয়ও পেয়েছি। তাঁর এই দয়া ছিল সূর্যের আলো বা নদীর জলের মতো—পাত্রাপাত্র বিচার করতো না। আসলে তাঁর মূল লক্ষ্য ছিলো এদেশীয়গণের মধ্যে শিক্ষার-বিস্তার করা,—সর্বস্তরের জনসাধারণের মধ্যে লেখাপড়ার চর্চা, সৎ ভাবে জীবন-যাপন করা, নৈতিকশক্তিতে উদ্বুদ্ধ এবং রুচিবান নাগরিক হিসেবে তৈরী হওয়ার আগ্রহসৃষ্টি করা। এই একলক্ষ্য গতি তাঁর সমস্ত কাজকেই নিয়ন্ত্রিত

করেছে। বিষয়টি যারা বুঝতে পারেনি তারা তাঁর চরিত্র বিচারে ভুল করেছে। যেমন, তিনি ধনীর ছেলেদের দিকে একটু ঝুঁকতেন বলে মনে হতো। যদিও হেয়ার ছিলেন ছাত্র-মাত্রের প্রতিই পক্ষপাতশূন্য, তথাপি কেন এমন আচরণ! যদি কেউ তাঁকে, তাঁর মুখের ওপর এই ব্যবহার সম্বন্ধে কোনো জিজ্ঞাসা রাখতো—তবে তার উত্তরে তিনি বলতেন: দেখো, এদেশে শিক্ষার প্রসারে প্রচুর টাকা দরকার। সরকার টাকা সম্বন্ধে তেমন উদার নয়। ওরা যদি এই শিক্ষা-ব্যবস্থা সম্বন্ধে আগ্রহ দেখায় তবে ওদের কাছ থেকে—প্রথমত, টাকা জোটানোর একটা উপায় হতে পারে। দ্বিতীয়, ঐ বড়লোকেরা টাকার জোরে সমাজে গণ্যমান্য লোক। তাদের ছেলেরা স্কুলে-পাঠশালায় আসতে আরম্ভ করলে সাধারণ ঘরের ছেলেরাও ওদের দেখা-দেখি আগ্রহান্বিত হবে, প্রয়োজনীয় অনুপ্রেরণাও লাভ করবে।

ঠিক এই কারণেই, ছাত্রদের স্বার্থে—তখনকার দিনের হিন্দু কলেজের সেরা শিক্ষক ডিরোজিওর পক্ষে তিনি কথা বলেছিলেন। ডিরোজিওর ব্যাপারটা বোধ হয় আমাদের সকলেরই জানা আছে। তবুও আর একবার বলি। ডিরোজিওর পুরো নাম হচ্ছে: হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও। ১৮০৯ খ্রীস্টাব্দে ডিরোজিও কোলকাতা ইণ্টালি পদ্ম-পুকুরের কাছে মমলালীর দরগা নামে একটি বাড়ীতে জন্মগ্রহণ করেন।

ডিরোজিওরা ছিলেন মোট তিন ভাই দুই বোন। ডিরোজিও ছিলেন ভায়েদের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ। এঁদের পিতা জে. স্কট কোম্পানীর সওদাগরী অফিসের একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী ছিলেন। ইনি জাতিতে ছিলেন পর্তুগীজ বংশোদ্ভূত ফিরিঙ্গী। ডিরোজিও বয়োপ্রাপ্ত হলে তিনি ধর্মতলায় অবস্থিত ডেভিড ড্রমণ্ড-এর স্কুলে ভর্তি হন। এখান থেকে চোদ্দ বছর বয়সে লেখাপড়া শেষ করে তিনি কিছুদিন বাবার অফিসে কেরাণীর কাজ করেন। এবং এর কদিন পরে ভাগলপুরে

তাঁর এক মাসীর বাড়ীতে যান। এইখানে তিনি 'জাঙ্গিরার ফকীর' নামে একটি কবিতার বই রচনা করেন। এরপর কোলকাতায় ফিরে এসে তিনি ঐ কবিতার বইটি প্রকাশ করলে তাঁর কবিত্বখ্যাতি প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এই সময়ে হিন্দু কলেজে একটি শিক্ষকের পদ খালি হয়। স্কুল কমিটি ডিরোজিওর পাণ্ডিত্য ও প্রতিভার যে পরিচয় ইতোপূর্বে পেয়েছিলেন তারই সুপারিশে ১৮২৬ খ্রীস্টাব্দের ১৩ই মে তাঁকে ঐ কলেজের চতুর্থ শ্রেণীর সাহিত্য ও ইতিহাসের শিক্ষকপদে নিযুক্ত করেন। ইনি প্রায় পাঁচ বছর এই কলেজের শিক্ষক হিসেবে কাজ করেছিলেন—১৮৩১ খ্রীস্টাব্দের ২৫ এপ্রিল ডিরোজিওকে চাকুরী থেকে বরখাস্ত করা হয়।— এই বছরেরই ২৬শে ডিসেম্বর তিনি কলেরা রোগে মৃত্যু বরণ করেন।

মাত্র বাইশ বছরের জীবন, মধ্যে পাঁচ বছরের হিন্দু কলেজের শিক্ষকতা, ডাক্তার গ্রাণ্টের 'ইণ্ডিয়া গেজেটে' প্রবন্ধ ও কবিতার চর্চা, হিন্দু ধর্মের ত্রুটিকে আক্রমণ করে 'এ্যাথেনিয়াম' নামে ইংরেজী মাসিক প্রকাশ, ১৮২৮-এ 'অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন' নামে একটি আলোচনা সভা গঠন এবং কর্মরত অবস্থায় 'হেসপেরাস' এবং কর্ম-চ্যুতির পর 'ঈস্ট ইণ্ডিয়ান' নামে পত্রিকার সম্পাদনা। এর মধ্যে দিয়ে ডিরোজিও তৎকালীন বঙ্গসমাজে 'প্রাচীন ও নবীনের সংঘর্ষণ ও ঘোর সামাজিক বিপ্লবের সূচনা' করেছিলেন। যুক্তি দিয়ে গোঁড়া সামাজিকগণের চিরপোষিত সকল বিশ্বাসের মূলে ডিরোজিও তাঁর অনুগামীদের প্রচণ্ড এবং নির্মম ভাবে আঘাত করতে শিক্ষা দিলেন। তাঁর অধ্যাপনায়, শিক্ষায়, বিদ্যাবত্তার সংস্পর্শে তৎকালের 'কালেজীয় বালকগণে'র মধ্যে যে নতুন আগুন জ্বলে উঠলো, নবজীবনের সঞ্চার হলো,—তার বহুমুখী প্রকাশ এবং প্রগতিশীলতা উনবিংশ শতাব্দীর নব্য বঙ্গে নতুন ক্রান্তিকালের সূচনা করলো।

আর আশ্চর্য প্রায় একান্ন বছরের প্রৌঢ় দেহ ও তরুণ মন নিয়ে

ডেভিড হেয়ার ডিরোজিওর পাশে এসে দাঁড়ালেন। হিন্দু কলেজের পরিচালক সমিতির গোঁড়া দেশীয় সদস্যগণ [বিশেষত রাধাকান্ত দেব ও রামকমল সেন] ডিরোজিও এবং তাঁর কর্মপদ্ধতিকে আক্রমণ করলে ডেভিড বরাবর তার বিরুদ্ধাচরণ করেছেন। তাঁর মত যে ডিরোজিও ভাল শিক্ষক,—তাঁর আমলে ছাত্রদের বুদ্ধিবৃত্তি এবং ধীশক্তির এমন উন্নতি, আর কখনও হয় নি। অতএব শিক্ষার স্বার্থে তাঁর শিক্ষকতাকে আঘাত না করাই উচিত। এই নিয়ে হেয়ারকে তৎকালীন প্রধান শিক্ষক ডি. আনসেলেম 'খোসামুদে' বলে গালাগাল করেছিলেন। কেবলমাত্র ভাল শিক্ষা ছেলেরা পাবে—দেশে প্রকৃত শিক্ষা বিস্তার হবে—ছাত্রদের বুদ্ধি শানিত তরোয়ালের মতো হয়ে উঠবে, এই বিচার করে হেয়ার সব রকমে ডিরোজিওর পোষকতা করে এসেছেন।

ঠিক এমনি স্বাধীনচিত্ততা এবং প্রগতিশীল ভাবধারার পরিচয় আরো অনেক ঘটনার মধ্যে দিয়ে হেয়ার নিজের জীবনে-আচরণে রেখে গেছেন। যেমন, ১৮২৩ খ্রীস্টাব্দে গভর্ণমেণ্ট মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা হরণ করে এক আইন পাশ করলেন। এর ফলে রামমোহন রায়ের 'মিরাৎ-উল্-আখবার' নামে ফারসী ভাষায় একটা পত্রিকা ছিলো সেটি উঠে গেল। সরকারের এই আচরণে দেশীয় বা বিদেশীয় স্বাধীনচেতা মানুষেরা খুবই ক্ষুব্ধ হলো। তাঁরা নানান সভা-সমিতির মাধ্যমে বিষয়টির প্রতি তাঁদের বিরুদ্ধ মনোভাব ব্যক্ত করতে থাকেন। ডেভিড হেয়ারও বিশেষ উৎসাহ ও আন্তরিকতার সঙ্গে এইসব সভা-সমিতিতে যোগ দিতেন—সরকারী নির্দেশের বিরুদ্ধে বক্তৃতাও করতেন। এই ভাবে প্রায় এগার বছর আন্দোলন চলার পর ১৮৩৫ খ্রীস্টাব্দে স্যার চার্লস মেট্কাফ এই বিধিনিষেধ রহিত করেন। অতএব এর মধ্যে দিয়ে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে হেয়ার কেবল স্কুল-কলেজ তৈরী করা নয়—যেখানেই মানুষের আত্মপ্রকাশের সুযোগ বা তার ব্যবস্থা রয়েছে

সেখানেই হেয়ার উপস্থিত। এর বাধা বা ব্যতিক্রমের বিরুদ্ধে তিনি তাঁর জ্ঞান-বিশ্বাস-বুদ্ধি ও সামর্থ্যানুযায়ী লড়াই করেছেন।

তখনকার দিনে বিদেশে যে কুখ্যাত কুলী-চালান দেওয়ার ব্যবস্থা ছিলো তার নিষ্ঠুরতা যে কোন সহৃদয় ব্যক্তিকেই স্পর্শ করতো। একবার ঠনঠনের কাছের এক বাড়ী থেকে কিছু কুলীদের আর্ত চিৎকার আশে-পাশের লোকেদের অস্থির করে তুলেছিলো। এমন সময় ঘটনাক্রমে সেখান দিয়ে হেয়ার যাচ্ছিলেন। তিনি কুলী চালানকারী বদমায়েশদের সমস্ত রকম বাধা অতিক্রম করে খোঁজ পেলেন যে এখানে মরিশাশে পাঠানোর জন্যে এমন একদল কুলীকে এনে জড়ো করা হয়েছে যারা বিদেশে কুলি হিসেবে চালান হতে সম্পূর্ণ অনিচ্ছুক। তাই তাদের এই চিৎকার—কান্নাকাটি। হেয়ার প্রথমে ভাল ভাবে বললেন যে এই অনিচ্ছুক লোকগুলিকে ছেড়ে দিতে। তারা হেয়ারের কথাকে গ্রাহ্যই করতে চাইলো না। হেয়ার তখন তাঁর সমস্ত ক্ষমতা-ও প্রতিপত্তি প্রয়োগ করে, পুলিশের সাহায্যে ঐসব হতভাগ্য মানুষদের উদ্ধার করে বাড়ী পাঠিয়ে দিলেন।

এবং হেয়ার এখানেই থামলেন না। এই কদর্য ব্যবস্থার বিরুদ্ধে হেয়ার আন্দোলন সুরু করে দিলেন। শেষে ১৮৩৮ খ্রীস্টাব্দের ১০ই জুলাই কোলকাতার টাউন হলে একটা বিরাট জনসভার ব্যবস্থা হলো। হেয়ার তাতে বক্তৃতা করলেন এবং সেখান থেকে কুলী চালানের বিরুদ্ধে একটি প্রস্তাব নিয়ে সরকারের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হলো।

এবার সরকারের টনক নড়লো। কোলকাতার পুলিশ কমিশনারকে দিয়ে সমস্ত বিষয়টি সম্পর্কে অনুসন্ধানের ব্যবস্থা হয় এবং যার ফলে কুলী-মজুর সংক্রান্ত একটা আইনও পাশ হয় ;—যা দিয়ে এই হীন ব্যবসায়ে কিছু অনুশাসন প্রযুক্ত করা সম্ভব হয়েছিলো। হেয়ারের সর্ব-ব্যাপক মানব-প্রেম এইভাবে তৎকালীন একটি সামাজিক-অনাচারের মূলোচ্ছেদ করে।

১১.

বঙ্গদেশ তথা ভারতবর্ষের সাধারণ শিক্ষার বীজ বপন করেছিলেন ডেভিড হেয়ার—কোন তর্ক বা বিভেদপন্থী কূটবুদ্ধিজীবীর বিরুদ্ধ মন্তব্য আজ আর এ বিষয়ে গ্রাহ্য নয়। ঠিক এমনি ভাবেই আর একটি বিশেষ শিক্ষার প্রবর্তনের ব্যাপারেও হেয়ারের অপরিসীম দান আমাদের শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করা উচিত। তা-হচ্ছে ১৮৩৫ খ্রীস্টাব্দের ১লা ফেব্রুয়ারী ইংরেজী ভাষার মধ্যে দিয়ে পাশ্চাত্ত্য চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষার জন্যে 'ক্যালকাটা মেডিকেল কলেজে'র প্রতিষ্ঠা।

হেয়ার ছিলেন যথার্থ নীরব কর্মী। আত্মপ্রশংসা, প্রচার, এই সমস্তের চেয়ে সত্যিকারের কাজ করা এবং সমগ্র সমাজকে তার সুফল ভক্ষণ করানো; এই মনোভাব—হেয়ারের কাছে কোনো ভড়ং বা বাইরের আবরণ-মাত্র ছিলো না। তাই যদি না হবে তবে তাঁর সামনেই, তাঁর বর্তমানেই ১৮৩০ খ্রীস্টাব্দে কোলকাতার সুপ্রীম কোর্টের গ্রাণ্ড জুরী রুমে প্রধান বিচারপতি স্যার হাইড ঈস্টকে হিন্দু কলেজের আদি প্রকল্পক এবং দেশীয় সমাজে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা প্রবর্তনের জনক আখ্যাত করে তাঁর মর্মরমূর্তি যখন প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে,—তখনও হেয়ার চুপ করে রয়েছেন কেনো। তিনি জানেন, কে এই কাজ করলো বা না করলো তা বড় নয়—যা করা হয়েছে তাকে বাঁচিয়ে রাখা যাবে কি না —এবং তা দিয়ে কতখানি উপকার সাধন করা যাবে সেইটাই সবচেয়ে বেশী জরুরী।

কিন্তু হেয়ার চুপ করে থাকলেও তাঁর প্রিয় ছাত্রেরা চুপ করে রইলো না। তাঁরা তাঁদের শিক্ষাদাতা পিতাকে—যিনি তাঁদের অজ্ঞানতার অন্ধকার থেকে জ্ঞানের আলোকে নিয়ে এসেছেন তাঁকে,— সম্মান না জানিয়ে পারলো না। তাঁরা ১৮৩১ খ্রীস্টাব্দের ১৭ই

ফেব্রুয়ারী হেয়ারের সাতান্নতম জন্মদিনে এক মহতী সভায় তাঁকে একটি মানপত্র দানের মধ্যে দিয়ে অভিনন্দন জানালেন। [উপসংহারে এই মানপত্র এবং তার উত্তর ছাপা আছে]।

যাঁরা এই সভার আয়োজন করেন, তাঁদের মধ্যে দক্ষিণানন্দ মুখোপাধ্যায়, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রসিককৃষ্ণ মল্লিক, রাধানাথ শিকদার, রামগোপাল ঘোষ, হরচন্দ্র ঘোষ, রামতনু লাহিড়ী, প্যারীচাঁদ মিত্র সহ আরও ৫৬৪ জন ছিলেন। এঁরা পরবর্তী কালে সকলেই জীবনের নানা ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলেন।

যাই হোক, এই মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠার সময়ে,—তারপর তার ছাত্র সংগ্রহে, আরো নানাভাবে হেয়ার একে যে সাহায্য করেছিলেন তার তুলনা পাওয়া ভার। এই কলেজের অধ্যক্ষ ডাঃ মণ্টফোর্ড জোসেফ ব্রামলি কলেজ প্রতিষ্ঠার এক বছর পরে যে রিপোর্ট দেন তাতে তিনি লিখলেন ঃ 'আমাকে যে অসুবিধাগুলির সম্মুখীন হতে হয়েছিল সেগুলি সম্পর্কে আমি বিস্তারিত আলোচনা করতে চাই না,…প্রধানত যাঁর সহায়তায় সেই বাধাগুলি উত্তীর্ণ হয়েছিলাম তাঁর প্রতি সুবিচার করতে গেলে এ বিষয়টি একটু বিশেষভাবে উল্লেখ করা আমার কর্তব্য বলে মনে করি। যে উদ্যোগী পুরুষ এই অমূল্য সাহায্য দান করে-ছিলেন তাঁর নাম ডেভিড হেয়ার। কলেজ স্থাপনের সরকারী নির্দেশ যখনই এই ভদ্রলোকের গোচরে এলো তখনই তিনি আপন উদার প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে কলেজ প্রতিষ্ঠার প্রত্যাশিত লক্ষ্যকে সফল করে তোলবার জন্যে আমাকে সাহায্য করতে এগিয়ে এসেছিলেন। তিনি ভালোভাবেই বুঝতে পেরেছিলেন যে এই কলেজ স্থাপনের উদ্দেশ্য কি? এবং কলেজ স্থাপিত হলে কি ব্যাপক সুফল তার থেকে লাভ করা যাবে। তাঁর পরামর্শ এবং সাহায্য আমার কাছে সব সময়েই ছিলো অমূল্য ; বক্তৃতাগুলিতে এবং সাধারণভাবে বলতে গেলে প্রতিষ্ঠানটিতে তিনি প্রায়ই উপস্থিত হতেন।…এক এক সময়ে আমাদের এমন

কতকগুলি বিচিত্র অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়েছিলো যাতে সমস্ত প্রতিষ্ঠানটির অস্তিত্বই বিপন্ন হয়ে উঠেছিল। একথা উল্লেখ করা কর্তব্য যে সেই বিপদের দিনে হেয়ারের ধৈর্য ও বিচক্ষণতাই আমাকে কার্যক্ষম রেখেছিল এবং উদ্দীপিত করে তুলেছিল। সত্যি কথা বলতে কি হেয়ারের সহায়তা ছাড়া হিন্দু চিকিৎসক সমাজ গঠনের যে কোন চেষ্টা ব্যর্থ হতো। এদেশবাসীরা চিকিৎসাশাস্ত্র শিক্ষার জন্যে তাঁর কাছে কতখানি ঋণী এবং আমি ব্যক্তিগতভাবে তাঁর কাছে কতখানি কৃতজ্ঞ সে কথা প্রকাশ্যে বিজ্ঞাপিত করবার সুযোগ আজ আমি গ্রহণ করছি।'

সব চেয়ে মজা হলো মড়া কাটা নিয়ে। গোঁড়া হিন্দুরা কিছুতেই মড়া কাটার প্রবর্তন করতে দেবেন না। কিন্তু শব ব্যবচ্ছেদ না শিখলে তো সবই ব্যর্থ হয়ে যাবে। গোঁড়াদের সমস্ত বাঁধাকে গুঁড়িয়ে দেবার জন্যে এগিয়ে এলেন হেয়ার। তিনি বুঝলেন যে হিন্দুদের মুখ বন্ধ করতে হলে হিন্দুধর্মেরই আশ্রয় নিতে হবে। তিনি সংস্কৃত কলেজের পণ্ডিতদের এই কাজে লাগালেন। এ ব্যাপারটি বর্ণনা করে বাবু রাম চট্টোপাধ্যায় বলেছেন: "একদিন সন্ধ্যেবেলায় তাঁর সঙ্গে বসেছিলাম, এমন সময় সংস্কৃত কলেজের আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের অধ্যাপক মধুসূদন গুপ্ত হন্তদন্ত হয়ে ঘরে ঢুকলেন। হেয়ার তাকে দেখে সঙ্গে সঙ্গে জিজ্ঞাসা করলেন: 'কি হে মধু, এতদিন কি করছিলে? তুমি জান না, তোমার জন্যে প্রায় এই সারা সপ্তাহ আমার কি মানসিক অশান্তি আর উদ্বেগ ভোগ করতে হচ্ছে? তোমাদের শাস্ত্রে লাস কাটবার অনুমতি কোথাও দেওয়া আছে কি না খুঁজে পেয়েছো?' মধুসূদন হ্যাঁ-সূচক উত্তর দিয়ে বললেন: 'সমাজের রক্ষণশীল লোকেদের কাছ থেকে বিরোধিতার ভয় আপনি আর করবেন না। তারা যদি বাধা দিতে এগিয়ে আসে, তাহলে আমি আর আমার পণ্ডিত বন্ধুরা সে বাধার সম্মুখীন হবার জন্যে প্রস্তুত রয়েছি'।"

এই কথা শুনে ডেভিড হেয়ার উল্লসিত হয়ে উঠলেন। এইবার তো আর কেউ মড়া কাটায় বাধা দিতে পারবে না। আরে মড়া না কাটলে কি ডাক্তারী শেখা যায়? শরীরের কোথায় কি আছে না জানলে কি শরীরের রোগ সারানো যাবে? আর অবস্থাটাও দেখ। এ পোড়া দেশে ভালো একটা কাজ কি করা যাবে! যা করতে যাবে, তাতেই ব্যাগড়া। বাপ্‌রে! দেশের বুকে যে জগদ্দল পাথর চেপে বসেছে তাকে সরাতে গেলেই সোরগোল, অশান্তি।

যাই হোক মড়া কাটা চলবে। হিন্দুদের শাস্ত্রই হিন্দুদের মুখে কসে চড় লাগিয়েছে। হেয়ার মহা আনন্দে এই খবর নিয়ে কলেজের অধ্যক্ষের কাছে চললেন, সঙ্গে ডেভিডের অনুরক্ত এবং সংস্কৃত কলেজের কৃতি ছাত্র ও অধ্যাপক মধুসূদন গুপ্ত। উভয়ে গিয়ে প্রিন্সিপ্যাল সাহেবকে জানালেন যে মড়া কাটা চলবে। হিন্দু শাস্ত্রে এর সমর্থন আছে।

ঘরে ঘরে সেই বার্তা রটে গেল ক্রমে। সারা দেশে সে কি প্রখর আলোচনা। মড়া কাটা হবে। হিন্দুর ছেলে হয়ে মুর্দফরাসের কাজ করবে। পাপে যে দেশ ভরে গেলো। আর যত নষ্টের গোড়া হচ্ছে ঐ হেয়ার সাহেব। সেই তো তার দলের ছাত্রদের তাতিয়ে-তুতিয়ে হাসপাতালে পড়তে ঢোকাবার ব্যবস্থা করেছে। এর মধ্যেই আবার বদ্যির বেটা মধুসূদন মড়া কাটা শুরু করবে।

চারদিকেই একটা হৈ হৈ কাণ্ড। কি হয়, কি হয় ভাব। একপক্ষ চক্ষু-কর্ণ দুটি ঢেকে, হাতে তুলসীমালা নিয়ে বসে কলিকালের অবসান আশঙ্কায় হরিনাম জপছে—আর অন্য পক্ষ ছুরি কাঁচি নিয়ে মড়া কাটতে চলেছে। দীর্ঘদিনের কুসংস্কার আর অজ্ঞানতার কালো পর্দাটাকে কেটে সরিয়ে দেওয়া হবে। সেদিন—সেই ১৮৩৬ খ্রীস্টাব্দের ১০ই জানুয়ারী তাই ভারতীয় ইতিহাসের একটি লাল অক্ষরের তারিখ।

বলা হয়, সেদিন নাকি এই ঘটনাকে স্মরণ করে গড়ের মাঠের কেল্লা

থেকে তোপ দাগা হয়েছিলো। এই ঘটনার তের বছর বাদে বেথুন সাহেব সেদিনের কথা বর্ণনা করে সুন্দর কাব্যময় ভাষায় যে বক্তৃতা দিয়েছিলেন তার একটু বাংলা অনুবাদ এখানে তুলে দেবার লোভ সামলাতে পারছি না। তিনি বলছেন: 'ঠিক নির্দিষ্ট সময়ে শারীরবিদ্যা এবং শল্যবিদ্যার অধ্যাপক ডাঃ হেনরী হ্যারি গুডিব মধুসূদনকে নিয়ে বীরদর্পে গুদামঘরে ঢুকলেন, যেখানে মৃতদেহটিকে শোয়ানো আছে; অন্যান্য ছাত্রদেরও অদম্য কৌতূহল—কিভাবে ঐ ভয়ঙ্কর পাপ কাজটা হচ্ছে তা দেখে,—জানে। তাই তাদের মধ্যে ভয়-কৌতুক-উৎসাহ মিলিয়ে অনুচ্চ গুঞ্জন উঠছে। কিন্তু কারো সাহস নেই ঐ ভীষণ বাড়ির মধ্যে ঢোকে। তাই রুদ্ধশ্বাসে কেউ জানালা দিয়ে, কেউ ঝিলিমিলির ফাঁক দিয়ে উঁকি মারছে। ওদিকে শক্ত এবং আত্ম-বিশ্বাসে পূর্ণ মধুসূদনের হাতের ছুরি যথার্থভাবে, শিক্ষানুযায়ী, মৃতদেহের শরীরে প্রবেশ করলো।'

আগে থেকেই দেখে আসছি যে কাজ পেলে হেয়ার আর কিছু চান না। যেখানেই কিছু কাজের মতো কাজ হচ্ছে, সেইখানেই হেয়ার হাজির। মেডিকেল কলেজ স্থাপিত হওয়ার কিছু আগে থেকেই স্কুল সংক্রান্ত ব্যাপারে তাঁর কিছু কিছু আশাভঙ্গ হচ্ছিলো। যেমন, ১৮৩৩-৩৪ খ্রীস্টাব্দে টাকা পয়সার টানাটানিতে স্কুল সোসাইটির কাজ-কর্মকে অনেকখানি গুটিয়ে আনতে হলো। কোথায় দিনে দিনে ঐ ব্যবস্থাপক সোসাইটি দেশে শিক্ষা বিস্তারের শাখা-প্রশাখাকে আরও বহুদূরে মেলে দেবে, তা নয়, শুরুতেই কুরকুট্টে মেরে গেলো। মনটা খারাপ। এরই মধ্যে ঐ একই কারণে—ঐ টাকার অভাবে, হেয়ারকে তাঁর বড় সাধের আরপুলির পাঠশালাটাকেও তুলে দিতে হলো।

কি করেন—কাজ তো চাই। যে মহাকাশের সীমানা মাপতে আরম্ভ করেছেন তিনি, তার কাজে তো এখনই থামলে চলবে না। তাঁর নিজের প্রিয় অনেক ছাত্রেরা অনেকে এর মধ্যে বেশ বড় হয়েছে—

বয়সে, মানে, বুদ্ধি ও বিদ্যায়। তারা কোলকাতা এবং শহরতলীতে অনেকগুলি বিনা মাইনের ইংরেজী-বাংলা স্কুল খুলেছে। তিনি সেগুলি দেখে বেড়াতে লাগলেন। তাদের ত্রৈমাসিক-যান্মাসিক বা বার্ষিক পরীক্ষাগুলির তত্ত্বাবধান করতে লাগলেন। এমন সময় তৈরী হলো মেডিকেল কলেজ। তিনি মহা উৎসাহে মেডিকেল কলেজের কাজে নিজেকে জড়িয়ে নিলেন। ঐ কলেজ তার জন্মলগ্নেই হেয়ারের ধাত্রীত্ব লাভ করে কতখানি উপকৃত হয়েছিল তা আগেই বলে এসেছি। এতদিন হেয়ার নিজেই নিজের জ্ঞান-বিদ্যা মতো নিজের পাল্কীতে ওষুধ বয়ে নিয়ে আর্তের চিকিৎসা করেছেন। আর আজ বিজ্ঞান সম্মত ভাবে, ব্যাপক ক্ষেত্রে রোগীর শুশ্রূষার ব্যবস্থা হচ্ছে। তিনি সবচেয়ে আনন্দিত হলেন।

হেয়ারের প্রিয় ছাত্র প্যারীচাঁদ মিত্র এ বিষয়ে বলছেন: 'মেডিকেল কলেজ স্থাপিত হওয়াবধি হেয়ার সাহেব তথায় প্রতিদিন যাইতেন। অন্যান্য বিদ্যালয়ে যেরূপ তদারক করিতেন মেডিকেল কলেজের বালকদিগকেও সেইরূপ তদারক করিতে লাগিলেন। আর হস্‌পিটলে যাইয়া প্রত্যেক রোগী কিরূপ আছে, ক্রমশঃ আরোগ্য হইতেছে, কিনা—বা পীড়ার বৃদ্ধি হইতেছে এ সমস্ত বিশেষরূপে অবগত হইয়া যথাসাধ্য প্রতিকার করিতেন। সকলের পথ্য ও অন্যান্য বিষয়ে যাহা জানিবার আবশ্যক হইত তাহা জানিয়া রোগীদিগকে আরামে রাখিবার জন্য সম্যকরূপে চেষ্টিত হইতেন।'

রোগী থেকে ছাত্র—ছাত্র থেকে পীড়িত, আর্ত—সর্বত্রই সেবার—দয়ার কল্যাণ-দীপ হস্তে স্নেহ ও প্রীতির স্মিত হাসি মুখে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন হেয়ার। ডেভিড হেয়ার। ভারতীয়দের জীবনের অন্ধকার অবসানের উষালগ্নে 'প্রভাতী তারা' মহামতি ডেভিড হেয়ার।

উপকৃত মেডিকেল কলেজের কর্তৃপক্ষ হেয়ারকে প্রথমে সম্পাদক, ও পরে কলেজ কাউন্সিলের অবৈতনিক সদস্য রূপে গ্রহণ করেন।

১২.

এতদিনে নবযুগের বাংলায় হেয়ার দেশের, দশের সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন। কেবলমাত্র পুরুষকারের সাহায্যে হেয়ার এক সামান্য ব্যক্তি থেকে, অসামান্য ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন চরিত্রে পরিণত হয়েছেন। সেদিনের বাংলায় যে কোনো মানসোৎকর্ষমূলক পরিকল্পনা বা কাজে, যে কোনো বিপদ বা বিপত্তিসঙ্কুল অগ্রগতির অনুষ্ঠানে হেয়ার আমন্ত্রণের অপেক্ষা না করেই হাজির হয়ে যেতেন। নাম চাই না, খেতাব চাই না, পদাধিকারেরও প্রয়োজন নেই;—কেবল কাজ, কাজ করতে দাও, তাতেই সন্তুষ্ট। কাজের দায়িত্বই হচ্ছে বেতন। সকলের ভালবাসা লাভই হচ্ছে পুরস্কার। নিরবচ্ছিন্ন সেবাই হচ্ছে আনন্দ।

অসংখ্য উদাহরণ, বহু-বিচিত্র ঘটনার উল্লেখ করে এই মহাত্মার ক্ষুদ্র জীবনের বিরাট ছবি আঁকা যায়। কিন্তু শত মুখে, কোটি কোটি শব্দ প্রয়োগ করেও হেয়ারের জীবন-চিত্র রচনায় তৃপ্তি লাভ করা যাবে বলে মনে হয় না। আমরা এখানে আর কয়েকটা মাত্র প্রধান ঘটনার উল্লেখ করে ক্ষান্ত দেবো।

কর্মচ্যুতির পর, ১৮২৮ খ্রীস্টাব্দ নাগাদ ডিরোজিও নিজ সভাপতিত্বে 'এ্যাকাডেমিক এসোসিয়েশন' নামে যে সভা স্থাপন করেন হেয়ার তার প্রায় প্রতিটি সভাতেই উপস্থিত থাকতেন। প্রত্যেক সপ্তাহে একবার করে ওর বৈঠক হতো। বিভিন্ন বিষয়ে সেখানে প্রবন্ধ পাঠ হতো। তার ওপর আলোচনা হতো, তর্ক-বিতর্ক হতো। হেয়ার সব কিছু মন দিয়ে শুনতেন। সে সম্বন্ধে প্রয়োজনে নিজের মতামত দিতেন। কখনও শ্রোতা বা বক্তার আসন থেকে সভাপতির পদে উন্নীত হয়ে সুচারুভাবে সভার কাজ পরিচালনা করতেন। ইয়ং বেঙ্গলদের এই

নবীন ভাবধারার, নতুন চিন্তা প্রকাশের সভায় হাজির থেকে, তাতে অংশগ্রহণ করে হেয়ার আপন বুদ্ধির প্রগতিশীলতা এবং মতামতের উদারতাকেই প্রকাশ করেছিলেন।

ঠিক এই ভাবেই ১৮৩৮ খ্রীস্টাব্দের ১২ই মার্চ হিন্দু কলেজের প্রাক্তন ছাত্রেরা তারাচাঁদ চক্রবর্তীকে সভাপতি করে 'সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভা' [The Society for the Acqusition of General Knowlege] নামে একটি সমিতি স্থাপন করেন। কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রামগোপাল ঘোষ, রামতনু লাহিড়ী, প্যারীচাঁদ মিত্র প্রমুখেরা এর সভ্য হন। সর্বসম্মতিক্রমে হেয়ার এর একজন উৎসাহী পৃষ্ঠপোষক ও সম্মানিত 'ভিজিটর' নির্বাচিত হন। এখানেও নবীনদের মধ্যে 'বৃদ্ধ-যুবক' হেয়ার আপন চিৎ-তারুণ্যের জোরেই একটি বিশিষ্ট স্থান করে নিয়েছিলেন।

স্বাভাবিক ভাবেই হিন্দু কলেজে ইংরেজী শিক্ষার ওপরেই বেশী জোর দেওয়া হয়েছিলো। কিন্তু এতে মাতৃভাষা অবহেলায় যথেষ্টরূপে অশক্ত হয়ে পড়েছিলেন। হেয়ার কোনো দিনও এমনটি চান নি। আমরা আগেই দেখে এসেছি হেয়ার বাঙালী ছেলেদের মাতৃভাষা শিক্ষার ওপরেই বেশী জোর দিয়েছেন। তাই হিন্দু কলেজের পরিচালকেরা বাংলা ভাষা ও সাহিত্য ভালভাবে শেখাবার জন্যে তারই সংলগ্নে একটি আদর্শ 'বাংলা পাঠশালা' স্থাপনের উদ্যোগ নেন। ১৮৩৯ খ্রীস্টাব্দের ১৪ই জুন এর ভিত্তি-প্রস্তর স্থাপিত হয়। নবযুগের চিৎ-প্রকর্ষের ভিত্তি সংস্থাপক হেয়ারকে এর ভিত্তি-প্রস্তর স্থাপন করতে দিয়ে কলেজের পরিচালকবৃন্দ সুবুদ্ধির পরিচয়ই দিয়েছিলেন।

যদিও খুবই সামান্য, তবুও একেবারে জীবন-সায়াহ্নে সদাশয় [?] সরকার হেয়ারকে কোলকাতার ছোট আদালতের [Court of Requests] তৃতীয় কমিশনার নিযুক্ত করেন। আসলে এই সব পুরস্কারে হেয়ারের কিছুই এসে যায় না। এই ঘটনায় সেদিনের 'ফ্রেণ্ড

অব ইণ্ডিয়া' তাই যথার্থ ভাবেই রোষ প্রকাশ করেছিলো। তিনি মানবের হৃদয়-সিংহাসনে সশ্রদ্ধায় অধিষ্ঠিত থেকে প্রীতি ও ভালবাসার যে অকৃত্রিম পুরস্কার পেয়েছেন তার তুলনায় যে কোন জাগতিক খেতাবই তুচ্ছ।

অনেক দিন হয়ে গেলো। দেব-শিশু স্বর্গ ছাড়া। অজ্ঞানতা রূপ অন্ধকারময় দৈত্যকে বধ করার জন্যে যে দেব-শিশু মর্ত্য-দেহ ধারণ করে এতদিন নতুন যুগের নব-ব্রজধামে লীলা করলেন, তাঁর এবার প্রত্যাবর্তনের সময় হয়েছে। তাঁর লাগানো শিক্ষাবৃক্ষ আজ বিরাট মহীরুহে পরিণত হয়ে সমগ্র গৌড়জনকে ফল ও ছায়া দান করছে। পরিতৃপ্ত হৃদয়ে, আরব্ধ কর্মান্তে ক্লান্ত সৈনিকের এবার বিদায় নেওয়ার সময় এসে গেলো। আমরা এই বিদায় ক্ষণটির চিত্র তাঁর প্রিয় ছাত্রকে দিয়ে আঁকিয়ে এখানে পরিবেষণ করি। তিনি বলছেন: '১৮৪২ খ্রীস্টাব্দে ৩১শে মে মাসের রাত্রে হেয়ার সাহেবের ওলাউঠা হয়। আপন সরদার বেহারাকে বলিলেন, গ্রে সাহেবকে বল, আমি বাঁচিব না—আপনার জন্য কফিন প্রস্তুত করিতে কহেন। পরদিবস বেলেস্তারার জ্বালা না সহিতে পারিয়া বলিলেন—আমাকে আরামে মরিতে দেও। কিছুকাল পরে প্রাণ ত্যাগ করিলেন। তাঁহার মৃত্যু সংবাদ শুনিয়া কলিকাতার সমস্ত লোক শোকান্বিত হইল। সহস্র সহস্র চক্ষু দিয়া অশ্রুপাত হইতে লাগিল—কেহ বিলাপে কাতর,—কেহ নিস্তব্ধ ভাবে অন্তরে রোরুদ্যমান—কেহ তাঁহার গুণবর্ণনে গলিত—কেহ কৃতজ্ঞতা ও ভক্তিতে ভারাক্রান্ত—কেহ যেন পিতৃশোক—কেহ যেন মাতৃশোক, কেহ যেন ভ্রাতৃশোক—কেহ যেন অকৃত্রিম বন্ধু শোকে ব্যাকুল। অঙ্গনাদিগের হৃদয় কোমল—তাহারা প্রপীড়িতা হইয়া দুঃখে মগ্ন হইলেন। বালকদিগের নয়নে অন্তরের শোক প্রকাশ

হইল।...হেয়ার সাহেবের দেহ স্বাভাবিক বেশে আচ্ছাদিত—কফিনে স্থাপিত—বদন শীতল ও শান্ত—নয়ন মুদিত—বালক ও যুবক নিকটে যাইয়া প্রেমে ও ভক্তিতে পূর্ণ হইয়া তাঁহার বদন স্পর্শ-পূর্বক অনিবার্য কাতরতার বিগলিত বারি বর্ষণ করিতে লাগিল। ১৮৪২ খ্রীস্টাব্দের ১লা জুনে ভারি দুর্যোগ হয়।—বৃষ্টি অবিশ্রান্ত পড়িতেছে—আকাশ ঘন মেঘে আচ্ছন্ন—রাস্তা সকল জলে সিক্ত, তথাচ লোকারণ্য হইল—মৃতদেহের সঙ্গে ন্যূনাধিক পাঁচ হাজার লোক চলিল—গাড়িতে রাস্তা পূর্ণ—কয়েকখানা কৃষ্ণবর্ণ শোক চিহ্নিত গাড়িতে ছোট ছোট বালক আরূঢ় হইল। কলিকাতার অনেক সম্ভ্রান্ত বাঙালী উপস্থিত ছিলেন। সন্ধ্যার প্রাক্‌কালীন, ঐ মহাত্মার সমাধি হইল।'

সব শেষ। শুভ্র পোষাক পরিহিত একটি শুভ্র হৃদয়-দীপ যে উজ্জ্বল আলো জ্বেলে দিয়ে গেলেন, তারই আলোকে তাঁকে আমরা পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি। ঐ ঋজু, দীর্ঘকায় লোকটি সবার ওপরে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছেন—অন্ধকারের অন্ত-সীমায় জ্বলন্ত তারকার মতো—'প্রভাতী তারা'—ডেভিড হেয়ার!!!

পরিশেষে আমরা ডেভিড হেয়ারের মহৎ জীবনের প্রতি—ছন্দের যাদুকর সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে, শ্রদ্ধা নিবেদন করি ঃ

ডেভিড হেয়ার

দুর্গতি-দুর্গম দেশে ভালবেসে আত্মীয়ের মত
জ্বেলেছিলে শুভ্র দীপ শুদ্ধ জ্ঞান প্রবুদ্ধ করিতে ;
জনমি খ্রীষ্টান-কুলে খ্রীষ্ট-নামে তরাতে তরিতে
চাহ নাই ; তাই ত নাস্তিক তুমি নর-সেবা-ব্রত !
অর্থদানে মুক্তপাণি বিদ্যাদানে অতন্দ্র নিয়ত,
আর্তের ছাত্রের বন্ধু, ছিলে পটু-মানুষ গড়িতে
স্নেহবিত্ত চিত্ত দানে ; নব্য বঙ্গে—বিকল ঘড়িতে

বিনি মূলে কল-বল নিত্য তুমি জোগায়েছ কত !
কুড়ায়ে পথের রোগী সংক্রামকে দিলে তুমি প্রাণ,—
তবুও নাস্তিক তুমি !—ও অস্থি নেবে না গোরস্থান ?
তাই ছাত্র-পল্লী-তলে বিরজিছ ছাত্রের দেবতা !
সমাধা—সমাধি সেথা পবিত্র ব্রতের যেথা সুরু।
ছাত্র-পরম্পরা স্মরে পুণ্য তব জীবনের কথা—
মনুষ্যত্ব—ধর্মে পূত—হে নাস্তিক ! আস্তিক্যের গুরু !'

●

উপসংহার

ক.

১৯৭৬ খ্রীস্টাব্দের ১৭ই ফেব্রুয়ারী মহাত্মা ডেভিড হেয়ারের দ্বিশত জন্মবর্ষ পূর্ণ হয়। এই উপলক্ষে কোলকাতার নাগরিকবৃন্দ ৯-১৭ ফেব্রুয়ারী হেয়ার সাহেবের জন্মবার্ষিকী পালনের উদ্দেশ্যে এক উৎসবের আয়োজন করেন। আমিই প্রথম বাঙালী যে সেই উৎসবকে স্মরণ করে কোলকাতার প্রখ্যাত দৈনিকপত্র 'সত্যযুগে'র ৯-২-৭৬ তারিখ সংখ্যায় "'প্রভাতী তারা' ডেভিড হেয়ার" নামে একটি প্রবন্ধ রচনা করি। প্রবন্ধটি একটি ভিন্নতর দৃষ্টিকোণ থেকে রচিত এবং এ বিষয়ে প্রথম প্রবন্ধ বলে এখানে তা হুবহু উদ্ধৃত হলো ঃ

আমাদের দেশে ইংরেজ চরিত্র হৃদয়হীন শোষক এবং নিষ্ঠুর শাসকরূপে চিত্রিত হয়েছে। শ্রেণীস্বরূপে এই ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদী হিসেবে ইতিহাসে নির্দেশিত। কিন্তু শ্রেণী স্বরূপের বাইরে যে ব্যক্তি মানুষটির সঙ্গে আমাদের পরিচয় হয় তিনি কি সব সময়েই তাঁর শ্রেণী-স্বভাব ও প্রয়োজনকে প্রকাশ করবেনই ; এমন কোনো বস্তুবাদী সুস্থির সিদ্ধান্তের নিরিখ আছে কি ? জানি না, কারণ এ বিষয়ে আমার জ্ঞান একান্তরূপে সীমাবদ্ধ। অথচ, আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সাম্রাজ্যবাদী শাসকশ্রেণীর জাতি পরিচয় নিয়ে এমন অনেক ইংরেজ আমাদের দেশে এসেছেন যাঁদের স্বভাব-চরিত্র আচার-আচরণকে কোনোক্রমেই আমরা শ্রেণীবিভাগের দিক থেকে হৃদয়হীন ও নিষ্ঠুররূপে নির্দিষ্ট করতে পারি না। এবং এই বৈপরীত্যের পরিচয় পেয়েই বোধ-হয় রবীন্দ্রনাথ আমাদের দেশের শাসক শ্রেণীকে ছোট ইংরেজ ও বড় ইংরেজ—এমনি দু-ভাগে ভাগ করেছিলেন। এবং আমাদের আলোচ্য

ব্যক্তিটির জীবনাচরণ পর্যালোচনা করে যদি তাঁকে বড় ইংরেজ বলি তাতে দোষ কি ?

১৭৭৫ খ্রীস্টাব্দে স্কটল্যাণ্ড দেশে ডেভিড হেয়ারের জন্ম হয়। এবং ১৮০০-তে পঁচিশ বৎসর বয়সে ঘড়ি তৈরী ও বিক্রির উদ্দেশ্য নিয়ে তিনি কোলকাতায় আসেন। এখানে তেমন কোন প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলো না—তাই অচির কাল মধ্যেই তিনি প্রভূত ধন ও যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা অর্জন করেন। এবং দেশীয় ও স্বদেশীয় লোকের সহায়তায় হেয়ার এদেশীয় বালকদিগের শিক্ষা—বিশেষত ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলবার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করতে থাকেন। এই পর্যন্ত শুনে হয়তো অনেকে মন্তব্য করতে চাইবেন যে হেয়ার শ্রেণী স্বার্থ এবং শ্রেণীচরিত্রকে অতিক্রম করলেন কই ? অপর দশজন ইংরেজের মতই তিনি ধন উপার্জন করেছেন—অত্যাচার ও নিষ্ঠুরতার পথে না হলেও। এবং ইংরেজের শোষণের বুনিয়াদ দৃঢ় করবার জন্যে এ দেশেই একদল কালা ইংরেজ তৈরীর যে যন্ত্র—অর্থাৎ ইংরেজ প্রবর্তিত পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার স্কুল প্রতিষ্ঠায় অগ্রণি হয়েছিলেন। এই দুদিক থেকে হেয়ারকে সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজের শ্রেণী স্বার্থের রক্ষাকারী বহুতর ব্রিটিশ নাগরিকদের মধ্যে অন্যতম হিসেবে গ্রহণ করা যেতে পারে।

সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গে উনবিংশ শতাব্দীর বঙ্গীয় নবজাগরণের কয়েকজন ব্যক্তিত্বের দ্বি বা সার্ধ বা শতবার্ষিক জন্ম অথবা মৃত্যু জয়ন্তীকে উপলক্ষ্য করে যে বুদ্ধির চর্চা সুরু হয়েছে তা থেকেই উপর্যুক্ত ধরণের প্রতিপাদ্য রচনার সূত্রপাত। আসলে ইতিহাসবোধ বর্জিত বুদ্ধি, এবং সমাজজ্ঞানের অভাবই এই রকম একপেশে ও নিজের প্রয়োজনভিত্তিক সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে সাহায্য করেছে। ডেভিড হেয়ারের সমাসন্ন দ্বিশত জন্মজয়ন্তী পূর্তির প্রস্তুতিতে সমগ্র বিষয়টি বুঝে নেওয়ার কিঞ্চিৎ প্রয়োজন আছে।

দেখা যাক, ডেভিড হেয়ারের জীবন চর্চা এবং কর্মপদ্ধতি কাদের

স্বার্থে ব্যবহৃত হয়েছে এবং সেই যুগ পরিবেশে তিনি কতদূর যেতে পারতেন বা পেরেছেন।

১৮০০ খ্রীস্টাব্দে হেয়ার সাহেব কোলকাতায় আসেন এবং ১৮৪২ খ্রীস্টাব্দের ১লা জুন দুরন্ত কলেরা রোগে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। এই প্রায় সাড়ে বেয়াল্লিশ বছর একজনের বা একটি জাতির জীবনে নেহাৎ কম সময় নয়। অধিকন্তু, এই সাড়ে বেয়াল্লিশ বছরই কোলকাতা বা বাংলা-দেশের পক্ষে সবচেয়ে টাল-মাটাল অবস্থা। সবচেয়ে অনিশ্চিত অস্থির ভাঙ্গার সময় [গড়ন আরম্ভ হয়েছে আরও এক-আধ দশক পরে]। হেয়ার নিজে যে খুব বেশী লেখাপড়া জানতেন তা নয়,—তবে তিনি অশিক্ষিত ছিলেন না, সংসারেও কোন ঝামেলা তাঁর ছিলো না। হেয়ার স্ট্রিটে [আধুনিক নাম] জমি ও নির্মায়মাণ বাড়ী, পটলডাঙ্গা, আরপুলি ইত্যাদি কোলকাতা ও আশে পাশে বিষয়-আশয় [বিষয়ী লোকের মতই], জমজমাট ঘড়ির ব্যবসা সব মিলিয়ে এদেশের উচ্চ, মধ্য এবং নিম্নবিত্ত মানুষদের সঙ্গে তিনি মিশেছেন, ব্যবসা করেছেন এবং দেখেছেন। তিনি তাঁর চলাফেরার পথে, দৈনন্দিন জীবনাচরণের প্রয়োজনে দেশের বয়স্ক মানুষদের নীতিহীনতা, চরিত্রস্খলন প্রভৃতি দেখে শিউরে উঠেছেন এই ভেবে যে, আজ যাদের নিয়ে দেশ চলছে, যাদের কেন্দ্র করে ইংরেজ শাসন ও সাম্রাজ্যের পত্তন ও ভবিষ্যৎ স্থায়িত্ব তাদের যদি এই অবস্থা হয় তবে এদের উত্তর পুরুষ যারা এসেছে বা আসছে তাদের পরিণতি কি হবে? অতএব কি করা যায়, কি করতে পারি? এর থেকে বাঁচবার পথ কোথায়? তার তীক্ষ্ণ বুদ্ধি এবং বৈষয়িক [?] মন ঠিক বুঝতে পেরেছে যে একমাত্র শিক্ষার আলোই এই অন্ধকারে পথ দেখাতে পারে। যারা বয়স্ক, পরিণত বুদ্ধি তাদের যা হবার হয়ে গেছে, কিন্তু তাদের আত্মজরা যাতে প্রকৃত শিক্ষা লাভের মাধ্যমে ঋজু চরিত্র লাভ করে, সুপ্ত বুদ্ধি ও বোধকে জাগিয়ে তুলতে পারে তার চেষ্টা করতে হবে। কিছুদিন

ধরেই বিষয়টি তাঁর মাথায় ঘুরছিলো, ১৮১৬ খ্রীস্টাব্দের প্রথম দিকে এই নিয়ে রামমোহনের সঙ্গে তাঁর কথা হয়। পরে কয়েকদিনের মধ্যে তৎকালীন সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি স্যার ই. এইচ. ঈস্টের কাছে চিন্তাটি পৌঁছে দেওয়া হয়। এবং নানা আলোচনা সভাসমিতি ও উদ্যোগের মধ্যে দিয়ে ১৮১৭ খ্রীস্টাব্দের ২০ জানুয়ারি গরানহাটায় গোরাচাঁদ বসাকের বাড়িতে হিন্দু কলেজের উদ্বোধন হয়। আধুনিক বাংলা তথা ভারতবর্ষের প্রসূতিগৃহ নির্মিত হলো।

এরপর হেয়ারের জীবন-কর্মের ধারা সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হয়ে গেলো। পরবর্তী যে পঁচিশ বছর চার মাস এগারদিন তিনি বেঁচে ছিলেন তার প্রত্যেকটি দিন এদেশীয় বালকদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার, ইংরেজী ও মাতৃভাষার প্রচার তদনুযায়ী পুস্তক রচনা ও প্রকাশ, তাদের স্বাস্থ্য, বেতন ইত্যাদি বিষয়ের ব্যবস্থা গ্রহণেই তার কেটে গিয়েছিলো।

এই কর্ম-ভূমিকাকে পেছনে রেখে কেউ যদি মন্তব্য করেন ঃ European colonialism-এর শিক্ষাব্যবস্থার প্রবর্তন ঘটিয়ে হেয়ার কার স্বার্থ চরিতার্থ করতে চেয়েছিলেন ? উত্তরে একথা কিছুতেই মেনে নেওয়া যাবে না যে, এতে কেবল সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজের সুবিধে হয়েছে। কারণ দেশের যে পারিপার্শ্বিকতায় এই ব্যবস্থার প্রচলন হয়েছিলো তাতে এই ধরণের শিক্ষাপদ্ধতির প্রবর্তন না করে উপায় ছিলো না। দ্বিতীয়ত, হেয়ার এই শিক্ষা প্রচলনের আদি প্রকল্পক এবং বিচারপতি ঈস্ট এর রূপায়ক হলেও তাঁরা উভয়েই চেয়েছিলেন যে স্থানীয় হিন্দুরাই এর উদ্যোক্তা হোন। তৃতীয়ত, হেয়ারের আগাগোড়াই ইচ্ছে ছিলো যে নব প্রতিষ্ঠিত রাজশক্তির ভাষা ও সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচয়ের পাশে পাশে প্রত্যেকে যাতে মাতৃভাষায় ব্যুৎপত্তি অর্জন করতে পারেন তার দিকেও নজর দেওয়া। চতুর্থত, কলেজ প্রতিষ্ঠার সময় যদিও দেশীয় উচ্চবিত্ত এবং মানীগুণী ব্যক্তিরা অংশগ্রহণ করেছিলেন, তথাপি হিন্দু কলেজ বা তার পাশাপাশি স্থাপিত

কোলকাতা স্কুল সোসাইটি, আরপুলি স্কুল ইত্যাদিতে মধ্য বা নিম্নবিত্ত এমনকি নিম্নবর্ণের মানুষগুলিরও প্রবেশাধিকার নিষিদ্ধ ছিলো না। [রামতনু লাহিড়ী মহাশয়ের শ্রেণীর মনিটার আদিত্য জাতিতে রজক ছিল]। পঞ্চমত, হিন্দু কলেজের শিক্ষক ডিরোজিও কর্তৃক যে বিপ্লবী ও প্রগতিশীল মনীষার কর্ষণা তৎকালীন বঙ্গ সমাজে তুমুল আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল হেয়ার সাহেব তারও একজন একনিষ্ঠ সমর্থক ছিলেন। অতএব এর থেকে আমরা এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে, হেয়ারের হাত দিয়ে এদেশে আধুনিক শিক্ষার যে আলো জ্বলেছিলো তাতে ইংরেজ যতখানি নিজের বুদ্ধি ও সামর্থ্য অনুযায়ী ফায়দা তুলতে পেরেছে, আমরা তা পারি নি, উপরন্তু অনেক ক্ষেত্রে নিজেদের ঘরও পুড়িয়েছি।

অধিকন্তু, সব কিছু বাদ দিয়েও—সম্পূর্ণ বিদেশী হয়েও, হেয়ার এদেশের মাটি ও মানুষকে যে ভাবে ভালবেসেছেন তার মূল্যও কি আমরা দিয়েছি। যে শিক্ষা আমাদের স্বাধিকারবোধ এবং আত্ম-চৈতন্যকে জাগিয়ে দিতে সাহায্য করেছিলো, যে শিক্ষাটুকু না পেলে আমাদের মধ্যবিত্ত মনীষার নবজাগরণ মুসলমান সমাজের মতো প্রায় অর্ধ শতাব্দীর অধিককাল পেছিয়ে যেতো, তার গোড়াপত্তন করে দিয়ে হেয়ার সাহেব যে মহানুভবতার পরিচয় দিয়েছেন তা এতদ্‌জাতীয়ের পক্ষে একটি দুর্লভ ঘটনা।

ঠিক এই কারণেই প্রত্যেকটি বাঙালী তথা ভারতবাসীর পক্ষে উপলব্ধি করা প্রয়োজন : 'হেয়ার সাহেবের জীবনপাঠে কে না উন্নত-ভাবে স্থিত হইবে? যে ব্যক্তি নিষ্কাম চিত্তে আপন বল, বুদ্ধি ও অর্থ—আপন জীবন পরোপকার্থে—পর সুখার্থে অর্পণ করিয়াছিলেন—যিনি আপন সুখ অন্বেষণ করেন নাই—ও যাহার কোন পার্থিব বাসনা ছিল না, তিনি যে দেবভাব প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন তাহা কে না স্বীকার করিবে?'